লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
১৫ আগষ্ট, ২০০৫ ঈসাব্দ

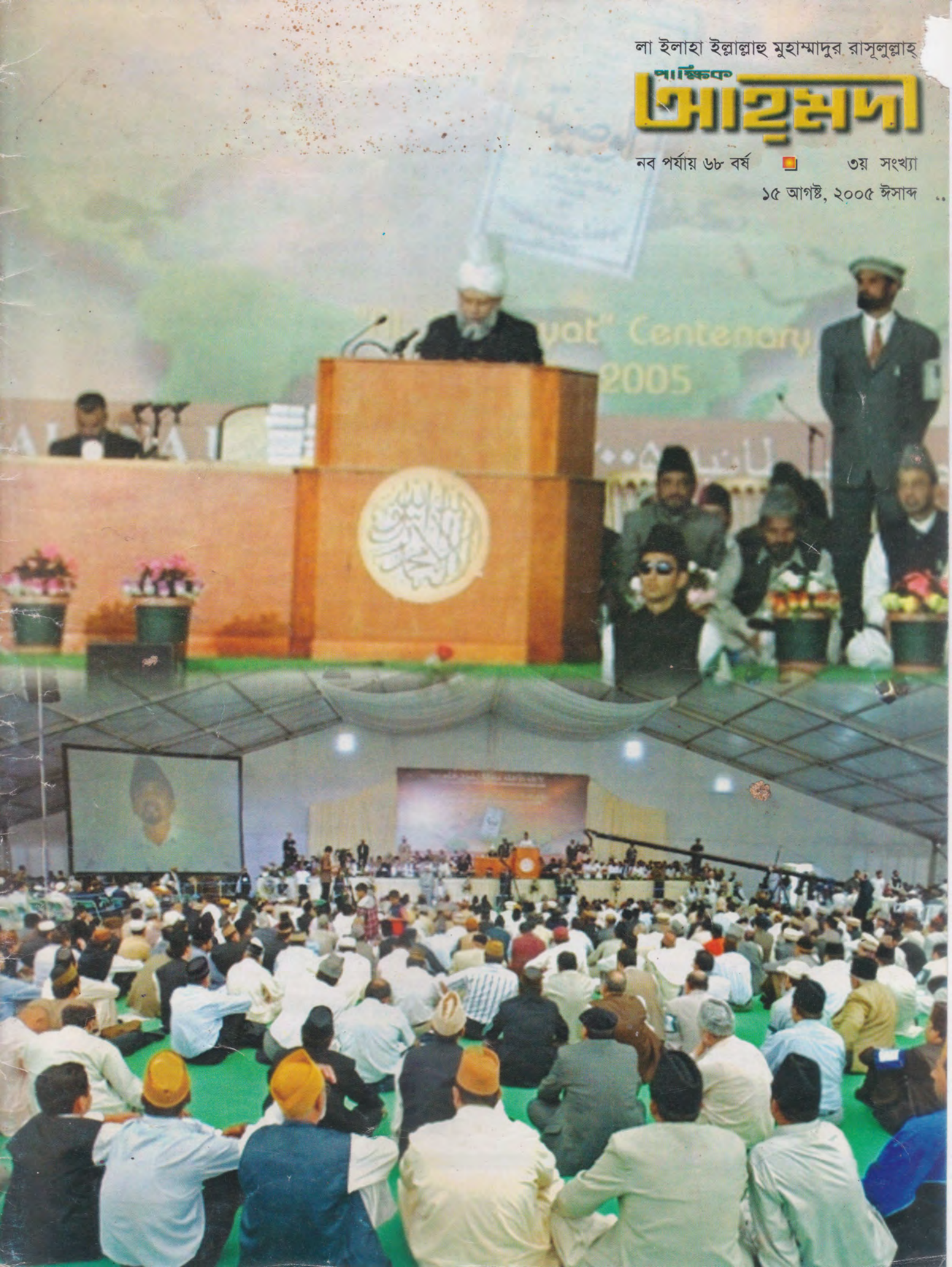

সম্পাদকীয়

ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম

বর্তমান যুগে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিহরণ জাগানো অগ্রগতি ও বহুমুখী ব্যবহারের ফলে বস্তুগত উন্নতির অনেক উপরে উঠছে।

তবুও, মানুষ সামগ্রিকভাবে সুখী হতে পারছে না, পরিতৃপ্ত হতে পারছে না। বৃদ্ধি পাচ্ছে অস্থিরতা, ভয়-ভীতি, শঙ্কা ও ভবিষ্যতের প্রতি অনাস্থা। বৃদ্ধি পাচ্ছে শোষণ, নির্যাতন, অন্যায় ও অরাজকতা। মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাস। অশান্ত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। মানুষ, শান্তির অন্বেষায় ব্যাকুল হয়ে পড়ছে। কিন্তু, আজ মানুষকে শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারছে না কোন সমাজ, কোন সংগঠন, কোন রাষ্ট্র; এমন কি কোন ধর্মও না। সর্বত্রই আজ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। কুরআনের বর্ণিত এ দৃশ্যই সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে- "যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররে ওয়াল বাহ্‌রে"- ফিৎনা-ফ্যাসাদ স্থল ও জল সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। (সূরা রূম-৪২)। তবে, কুরআনের মান্যকারীদেরকে এ অবস্থার প্রেক্ষিতেও সতর্ক করে বলা হয়েছিল তোমরা এই ফিৎনা-ফ্যাসাদে জড়াবে না। কেননা "*ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুল ফাসাদ*" আল্লাহ্‌তাআলা ফ্যাসাদকে পছন্দ করেন না। (বাকারা-২০৬)

কিন্তু আজ আমরা অত্যন্ত পরিতাপ ও বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি, যে ইসলাম ফিৎনা-ফ্যাসাদকে ভালবাসে না, যে ইসলাম শান্তির ধর্ম, যে ইসলামকে শান্তির পতাকা ও শান্তির শ্লোগান দিয়ে রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) জগতে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই ইসলামের অনুসারীরা নিজেদের মাঝে ইসলামের নামে ফিৎনা-ফ্যাসাদ করে যাচ্ছে। জগতে অশান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে। এমন কি ইসলামের নামে তারা তথাকথিত ইসলামিক সন্ত্রাসবাদকেও ছড়াচ্ছে !

ইসলামের নামে সন্ত্রাস, এটা পাকিস্তানেই হোক আর বাংলাদেশেই হোক, নিউইর্য়কেই হোক আর লন্ডনেই হোক। আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি, এর সাথে প্রকৃত ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার কোন ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। এর দ্বারা প্রকৃত ইসলামকে শুধুমাত্র কলংকিত করা হচ্ছে। প্রকৃত ইসলাম যেখানে থাকবে সেখানে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড কিছুতেই থাকতে পারে না। যেভাবে আলোর সঙ্গে অন্ধকার অথবা জীবনের সঙ্গে মৃত্যু অথবা শান্তির সঙ্গে যুদ্ধ থাকতে পারে না।

সন্ত্রাস, যে ব্রান্ডেই হোক, সেটা ইসলামী ব্রান্ড হোক অথবা অন্য কোন ব্রান্ড- সন্ত্রাস, সন্ত্রাস-ই। সন্ত্রাস পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির হাতিয়ার, মানবতার শত্রু। সর্বোপরি শান্তি বিনষ্টকারী। তাই মানবতার স্বার্থে, ইসলামের স্বার্থে, সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে নিন্দা করা দরকার, বন্ধ করা দরকার। আমরা এ দাবী জানিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন-

"আল্লাহ্‌র খাতিরে সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, যাতে আকাশ হতে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়। তোমরা সর্বপ্রকার পার্থিব ঘৃণা ও বিদ্বেষকে পরিত্যাগ কর এবং মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে বিলীন হয়ে যাও" (মলফূযাত)।

আমরা আশা করি, যারা শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম ইসলামের সাথে সন্ত্রাসকে যুক্ত করে এর মহান আদর্শে কলংক লেপন করে যাচ্ছে; তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। তারা আল্লাহ্‌র খাতিরে শান্তির পথে চলে আসবে; তারাও জামাতে আহমদীয়ার মত 'LOVE FOR ALL, HATERED FOR NONE' ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে-এ শ্লোগান প্রতিধ্বনিত করে ইসলামের মহান আদর্শকে জগতে সমুন্নত করবে। আর আমাদের এ সুন্দর পৃথিবী হবে অনাবিল শান্তির নীড়।

১৫ আগস্ট, ২০০৫ইং

সূচীপত্র পৃষ্ঠা নং

- কুরআন শরীফ ৩
- হাদীস শরীফ ৪
- অমৃতবাণী ৫
- জুমুআর খুতবা ঃ স্বল্পে-তুষ্টতা ৬-১২
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ ঃ *মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*
- জুমুআর খুতবা ঃ মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ১৩-১৮
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ- *মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী*
- ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ? ১৯-২১
  হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ)
  অনুবাদ- *শাহ মুস্তাফিজুর রহমান*
- আহমদীয়ত ২২-২৩
  মূল- কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব ফাযেল
  অনুবাদ- *মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*
- কাদিয়ান আওর উসকে মোকাদ্দাস-মোকামাত ২৪-২৬
  মূল- মুহাম্মদ হামীদ কাওসার
  অনুবাদ- *নাজির আহমদ ভূঁইয়া*
- হযরত হাফেয হেকীম মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ) ২৭-২৮
  অনুবাদ- *মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমিন*
- মৃত্যুঞ্জয়ী আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী ২৯-৩০
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- মুলাকাৎ ৩১-৩২
  অনুবাদ- *আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী*
- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র ৩৩
  সংকলন- *ইয়াকুব আলী ইরফানী*
  অনুবাদ- *মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*
- জন্ডিস প্রতিরোধ করুন ও সুস্থ থাকুন ৩৪
  ডাঃ পারভীন হাকিম আনোয়ার
- দেশীয় ফলের ওষধি গুণ ৩৫-৩৬
  মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী
- সংবাদ ঃ ৩৭
- আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৮

প্রচ্ছদ ঃ যুক্তরাজ্য জামাতের ৩৯তম সালানা জলসা

ছবি ঃ হাফিয়া তাসাদ্দক

কুরআন শরীফ

সূরা আত তাওবা

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَاَوْضَعُوْا
خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। তারা যদি তোমাদের সাথে (জেহাদে) বের হতো তাহলেও তারা তোমাদের সাথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন কাজেই আসতো না এবং তোমাদের মাঝে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তারা তোমাদের মাঝে ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়াত। অথচ তোমাদের মাঝে তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার লোকও রয়েছে, আর আল্লাহ্ যালেমদের ভালভাবেই জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ
حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। নিশ্চয় তারা আগেও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল আর তোমার জন্য পরিস্থিতি ঘোলাটে করে দিয়েছিল। অবশেষে সত্য এবং আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হলো তবুও এরা তা ভীষণ অপছন্দ করছিল।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ۗ اَلَا فِي
الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এদের এক শ্রেণীর লোক বলে, 'তুমি আমাকে (বাড়িতে বসে থাকার) অনুমতি দাও এবং আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলো না। (জেনে রেখো) তারা তো পরীক্ষায় পড়েই রয়েছে। আর জাহান্নাম কাফিরদেরকে সব দিক থেকে পরিবেষ্টনকারী।

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ
يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ
فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। তোমার ভাল হলে তাদের কষ্ট হয় আর তোমার কোন বিপদ হলে তারা বলে, 'নিশ্চয় আমরা আগেই আমাদের বিষয়ে শামলে নিয়েছিলাম।' আর তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফিরে যায়।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। তুমি বল, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত বিপদ ছাড়া কখনও অন্য কোন বিপদ আসবে না। তিনিই আমাদের অবিভাবক। আর মু'মিনদের কেবল আল্লাহ্র ওপর ভরসা করা উচিত।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۗ
وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ
مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۚ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ
مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। তুমি বল, 'তোমরা কেবল আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের[১১৯০] মাঝে একটিরই অপেক্ষা করতে পার; আর আমরা তোমাদের বিষয়ে অপেক্ষা করছি, হয় আল্লাহ্ নিজ পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দিয়ে তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে নিশ্চয় অপেক্ষায় রইলাম।

১১৯০। প্রকৃত মুসলমান আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে শহীদ হয় অথবা বিজয়ী। তার জন্য আর কোন বিকল্প পথ নেই।

হাদীস শরীফ

ভ্রাতৃত্ববোধ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⑪

অর্থাৎ নিশ্চয় মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক সন্ধি স্থাপন করো আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো, যাতে তোমাদের ওপরে রহম করা যায় (সূরা হুজরাত: ১১ আয়াত)।

হাদীস ঃ "আন আনাসিন ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা ওয়াল্লাযী নাফসি বিইয়াদিহী লাইউ'মিনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বু লি আখিহি মা ইউহিব্বু লিনাফসিহী (বুখারী)।

অর্থাৎ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি ঐ সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ যে, তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের ভাই-এর জন্য উহা পসন্দ করে যা সে নিজের জন্যে পসন্দ করে থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন, যারা ঈমানে পরিপূর্ণ তারা সবাই ভাই ভাই অর্থাৎ তারা একে অপরের জন্য সর্বদা মমত্ব বোধ করেন। আল্লাহ্‌তাআলা চান প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই হয়ে এক সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলুক। হযরত নবী করীম (সঃ) খোদার কসম খেয়ে মু'মিনদের প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের চিত্র অংকণ করে বলেছেন, তোমরা যা নিজের জন্য পসন্দ কর তা নিজের ভাই-এর জন্যেও পসন্দ কর। নতুবা তোমাদের ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ হবে। ঈমানের পরিপূর্ণতা তোমাদের মাঝে প্রেম, সৌহার্দ্য ও মমতাকে জাগিয়ে তুলবে ও স্বর্গতুল্য এক সমাজ গড়ে উঠবে। হুযূর (সঃ) এই হাদীস দ্বারা মুসলমানদের মাঝের দূরত্ব ও অহংবোধের মূলোৎপাটন করেছেন। এবং সকল মুসলমানকে এক করে দিয়েছেন। কিন্তু আজ মুসলমান বিভিন্ন দল ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে। নিজের জন্য কল্যাণের আকাঙ্খা করে ও তা অর্জনও করে স্বার্থপরের মত। অন্য ভাই-এর দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না।

নিজ আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করতে হবে ও তাদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আজ মুসলিম বিশ্বের যে দলাদলি ও অশান্তি তার একমাত্র সমাধান হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও কুরআনের শিক্ষার উপর আমল। ইহা ব্যতিরেকে অন্য কোন আন্দোলন বা মন্ত্র বা শক্তি নেই যা মুসলমানদের দুর্দশা লাঘব করবে।

আঁ হযরত (সঃ) যে ভ্রাতৃত্বের নক্সা ইসলামী বিশ্বের ও মুসলমানদের জন্য চেয়েছেন, হায়! যদি আমরা তা বাস্তবায়িত করতে পারতাম! আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে এই শিক্ষার উপর আমল করার তৌফীক দিন। আমীন।

অনুবাদ ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ**
সদর মুরব্বী

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

কাহিনীতে সন্তুষ্ট হইও না

খোদাতাআলা পূর্বে যেরূপ ছিলেন এখনো তদ্রূপই আছেন। তাঁর 'কুদরত' বা শক্তিনিচয় পূর্বে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। পূর্বে যেরূপ তাঁর নিদর্শন প্রদর্শন করবার ক্ষমতা ছিল, এখনো তদ্রূপই আছে। অতএব তোমারা শুধু কিস্‌সা কাহিনীতেই কেন সন্তুষ্ট থাক? সেই ধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত, যার মো'জেযা বা আলৌকিক ক্রিয়াসমূহ এবং ভবিষ্যদ্বাণীসমূহও কেবল কিস্‌সা। সেই জামা'ত ধ্বংসপ্রাপ্ত, যার উপর খোদাতাআলার জ্যোতিঃ অবতীর্ণ হয় নি এবং যা 'একীনের সাহায্যে খোদাতাআলার হস্ত দ্বারা পবিত্র হয় নি।

মানব যেমন ভোগের ইন্দ্রিয়ের সামগ্রী দেখে সে দিকে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মানব যখন 'একীনের' সাহায্যে আধ্যাত্মিক স্বাদ লাভ করে, তখন সে খোদাতাআলার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর সৌন্দর্য তাকে এরূপ মুগ্ধ করে দেয় যে, অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তার নিকট একেবারে তুচ্ছ ও পরিত্যাজ্য বোধ হয়। মানুষ তখনই পাপ হতে পরিত্রাণ পায়, যখন সে খোদাতাআলা এবং তাঁর 'জব্‌রুত' (মহাশক্তি) ও 'জাযা-সাজা' (পুরস্কার-শাস্তি) সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে। অজ্ঞতাই সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ। যে ব্যক্তি খোদাতাআলার 'একীনী মা' রেফত' (নিশ্চিত জ্ঞান) হতে কিছুমাত্র অংশ লাভ করে, সে কখনো উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে না। যদি কোন গৃহস্বামী বুঝতে পারে যে, এক প্রবল বন্যা তাঁর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, কিংবা তার গৃহের চতুর্দিকে আগুন লেগেছে এবং অল্পমাত্র স্থান বাকী আছে, তবে সে সেই গৃহে তিষ্ঠিতে পারে না। এমতাবস্থায় খোদাতাআলার বিধি-বিধান 'একীন' বা স্থির-নিশ্চিত জ্ঞানের দাবী করার পর তোমরা কেমন করে এরূপ ভীষণ অবস্থায় রয়েছো? সুতরাং তোমরা চক্ষু উন্মুক্ত করে খোদাতাআলার সেই নিয়ম অবলোকন কর যা সমগ্র দুনিয়ায় পরিলক্ষিত হয়। অধোগামী ইঁদুর সাজিও না বরং ঊর্ধ্বগামী কবুতর হতে চেষ্টা কর- যা নভোমন্ডলে বিচরণ করা পসন্দ করে।

তোমরা 'তওবা' করে 'বয়াত গ্রহণ করার পর পুনরায় পাপে লিপ্ত থেক না এবং সর্প সদৃশ্য হয়োও না, যা খোলস পরিবর্তন করার পরও সর্পই থেকে যায়। মৃত্যুকে স্মরণ রেখ, কারণ ইহা তোমাদের নিকট বিচরণ করছে এবং তোমরা তদ্‌সম্বন্ধে অজ্ঞ। চেষ্টা কর যেন পবিত্র হও, কারণ মানুষ পবিত্র অস্তিত্বকে তখনই লাভ করতে পারে যখন সে স্বয়ং পবিত্র হয়।

(কিশতিয়ে নূহ পুস্তক)

অনুবাদ- **মরহুম মৌলভী আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি**

স্বল্পে-তুষ্টতা

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস কর্তৃক ৩০ এপ্রিল, ২০০৪ তারিখ মসজিদ বায়তুল ফুতূহ মরডেন লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আলে ইমরানের ১৫ আয়াত তেলাওয়াত করে জুমুআর খুতবা দেন।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٥﴾

এর অনুবাদ হুযূর (আইঃ) এভাবে করেন ঃ

লোকদের কাছে স্বাভাবিকভাবে পছন্দের জিনিসগুলোর অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের, সন্তান-সন্ততির, স্তূপীকৃত সোনা-রূপার, বৈশিষ্ট্যমন্ডিত চিহ্নিত ঘোড়াগুলোর, গৃহপালিত পশুর এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি ভালবাসা সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। এসব পার্থিব জীবনের সাময়িক উপকরণ আর আল্লাহ্ তিনি, যাঁর কাছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছে। আল্লাহ্তাআলা বলেন, পার্থিব লোক স্বাভাবিকভাবে এগুলো পছন্দ করে থাকে যেন তাদের কাছে স্ত্রী হিসেবে সুন্দর ও সম্পদশালী স্ত্রীলোক থাকে। আজকালও দেখে নিন, সম্পদশালী লোক অর্থশালী লোক অথবা এর ধান্দায় রয়েছে এমন অধিকাংশ লোক ধনী ঘরে এ জন্য বিয়ে-শাদী করে থাকে যেন তাদের কাছ থেকে হয় ধন-দৌলত লাভ হয় বা উভয়ের পক্ষ থেকে সম্পদ একত্র করে তাদের ধন-সম্পদে প্রবৃদ্ধি ঘটে। যে চারটি কারণকে ভিত্তি করে বিয়ে-শাদী করা কর্তব্য সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। অর্থাৎ ধন-সম্পদ (যেভাবে হাদীসে এসেছে), বংশ, সৌন্দর্য বা ধর্মপরায়ণতা এগুলোর মাঝে আল্লাহ্তাআলার দৃষ্টিতে সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো ধর্ম অথচ এ দিকে কম দৃষ্টি দেয়া হয়ে থাকে এবং ধন-সম্পদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দেয়া হয়। আবার সন্তান-সন্ততির আকাঙ্ক্ষাও হয়ে থাকে। সন্তানদের মাঝে ছেলে হোক এ আকাঙ্ক্ষাই বেশি হয়ে থাকে।

আজকাল শিক্ষিত লোকদের মাঝেও, উন্নতিশীল বিশ্বেও এ চিন্তা করা হয়, আর এ চিন্তা ব্যাপকভাবে করা হয়ে থাকে যেন ছেলে হয় আর বাবার মত পার্থিব কাজে বাবার সাথে কাজ করে। আবার, যেভাবে আমি বলেছি, ধন-সম্পদ হোক! পাহাড় তুল্য ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে আর যত ধন-সম্পদ লাভ হয় ততই এর লালসা বেড়ে যেতে থাকে এবং চেষ্টা এটাই হয়ে থাকে, যেভাবেই হোক ধন-সম্পদ লাভ করা চাই। অন্যের জায়গা-জমি দখল করে জায়গা-জমি বানানো গেলে বানানো হোক। অন্যের প্লটও দখল করা হোক, ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রসার ঘটুক, কলখারখানা বানানো হোক, প্রত্যেক নতুন মডেলের গাড়ী কেনা অবশ্য-কর্তব্য মনে করা হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, এসবই এ পার্থিব জ্ঞানের সাময়িক উপকরণ। **এ সাময়িক উপকরণের পেছনে ছুটা একজন মু'মিনের সাজে না। পৃথিবীর পেছনে ছুটা তো কাফিরের কাজ। বেঈমানের কাজ। তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টি তো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, তাঁর ইবাদত এবং তাঁর সৃষ্টির সেবা হওয়া উচিত।** কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ সুন্দর ও পবিত্র শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলমানরা পার্থিবতাকেই আকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টি বানিয়ে নিয়েছে। আর লোভ-লালসা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দজ্জালের ধোঁকার এটাও ছিল একটা কৌশল। এর উদ্দেশ্য মুসলমানদের ধর্ম থেকে পেছনে হটিয়ে দেয়া। তারা এতে সফলতাও লাভ করে গেছে। স্বল্পে-তুষ্টতা ও অনাড়ম্বরতাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। বিলাসিতার প্রতি বেশি ঝোঁক এবং ধনী থেকে ধনী হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

অতএব এমন অবস্থায় বিশেষভাবে আহমদীদের ওপর এ দায়িত্ব বর্তায় আর প্রত্যেক পর্যায়ের আহমদীদের ওপর স্বল্পে-তুষ্টতা ও অনাড়ম্বরতা আত্মস্থ করার এ দায়িত্ব বর্তায়। তাহলে ধর্মের সেবার সুযোগ লাভ হবে। ধর্মের সেবায় আর্থিক কুরবানীর সৌভাগ্য লাভ হবে। নিজেদের অভাবী ভাইদের সেবা করারও সৌভাগ্য লাভ হবে। এদের সেবা করার ফলে খোদাতাআলার সন্তুষ্টি লাভেরও সৌভাগ্য হবে। আর পার্থিব কাজে নিমগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে আল্লাহ্তাআলার ইবাদত করারও সৌভাগ্য লাভ হবে। শেষ পর্যন্ত তো আল্লাহ্তাআলার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে। এভাবেই জীবন চলছে। একদিন এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। তাই আল্লাহ্তাআলা বলে দিয়েছেন, সেটাই উত্তম স্থান আর উত্তম স্থান তখন লাভ হবে যখন পার্থিবতাকে পরিহার করে আমার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করবে এবং আমার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী কাজ করবে।

অন্য এক স্থানে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন- **ওয়ামা হাযিহিলহায়াতু দুনইয়া ইল্লা লাহউঁ ওয়া লাইবুন-ওয়া ইন্নাদ্দারাল আখিরাতা লাহিয়াল হায়াওয়ান- লাও কানূ ইয়া'লামুন**- অর্থাৎ এ পার্থিব জীবন আমোদ-প্রমোদ ও খেলা-ধূলা ছাড়া আর কিছু নয়। আর পারলৌকিক জীবনই হচ্ছে প্রকৃত জীবন, হায় যদি তারা জানতো (সূরা আনকাবূত ঃ ৬৫)।

আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, পার্থিব জীবনের ঝলকানিকে মু'মিনের জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে নেয়া উচিত নয়। এ দুনিয়াকেই জীবনসর্বস্ব মনে করে বসা কাফিরদের কাজ। মু'মিনদের আসল কাজ হলো আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি লাভ। দুনিয়ার পেছনে ধাওয়া করা নয়। আর যতক্ষণ মানুষের মাঝে স্বল্পে-তুষ্টতা সৃষ্টি না হয়, অনাড়ম্বরতা সৃষ্টি না হয় তখন অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যের অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে যায়। স্বল্পে-তুষ্টতা সৃষ্টি হলে অন্যের কাছে কি আছে বা কি নেই সে সম্বন্ধে তার সামান্যতমও উৎসাহ সৃষ্টি হবে না। বরং সে পুণ্যে তার চেয়ে অগ্রগামী লোককে দেখবে, ঈর্ষা করবে আর পুণ্যে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রতি কার্যক্রম গ্রহণ করবে। আর তার সামনে সব সময় এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করার ও মারা যাওয়ার পরেও আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য লাভের চেষ্টার বিষয়টি থাকবে। আমরা আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ-নিষেধ পালন করে তাঁর নৈকট্য লাভ করি এটাই আল্লাহ্‌তাআলা চান। আল্লাহ্‌তাআলা বার বার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখানেও এ কথাই বলেছেন, হায়, তোমরা যদি জানতে দুনিয়ার প্রতি অগ্রসর হয়ে তোমরা কোন্ ধ্বংসের প্রতি এগিয়ে যাচ্ছ! পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও দ্রব্য-সামগ্রী আল্লাহ্‌তাআলা সৃষ্টি করেছেন। এথেকে উপকৃত হওয়া কোন পাপ কাজ নয় বরং এথেকে উপকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এটা লাভ করার জন্যে ভুল পথ অবলম্বন, নিজের কাছে যা কিছু আছে এতে তুষ্ট না হওয়া এবং অন্যের প্রতি হিংসা করা, নিজের জীবনকে সাদা-সিদে বানিয়ে নিজের ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করে ধর্মের প্রয়োজনে কুরবানী না দেয়া অন্যায়। আল্লাহ্‌তাআলার নেয়ামত ব্যবহার করা অন্যায় নয়, বরং সেই ধ্যান-ধারণা যার প্রভাবে এমন সব কাজ-কর্ম করা হয় তা মন্দ। আর প্রত্যেক আহমদীকে অবশ্যই এথেকে সুরক্ষা পেতে হবে।

এথেকে উপকৃত হওয়া কোন পাপ কাজ নয় বরং এথেকে উপকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এটা লাভ করার জন্যে ভুল পথ অবলম্বন, নিজের কাছে যা কিছু আছে এতে তুষ্ট না হওয়া এবং অন্যের প্রতি হিংসা করা, নিজের জীবনকে সাদা-সিদে বানিয়ে নিজের ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করে ধর্মের প্রয়োজনে কুরবানী না দেয়া অন্যায়।

কোন কোন লোক অবশ্য-দেয় চাঁদাগুলো বা অঙ্গীকার করতে হয় এমন চাঁদাগুলোর ব্যাপারে উদাসীন; কিন্তু নিজেদের কামনা-বাসনাকে কম করে না। স্বল্পে-তুষ্টতা ও অনাড়ম্বরতা সৃষ্টি হলে চাঁদার বোঝা কখনই অনুভূত হবে না। তাই প্রত্যেক আহমদীকে সব সময় স্বল্পে-তুষ্টতা ও অনাড়ম্বরতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। এটা যদি সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে আমরা অনেক মন্দ কাজ থেকে সুরক্ষা পেতে পারি। আর এরই সাথে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্যে আমাদের কাছে অর্থ সঞ্চিত হতে থাকবে, আমাদের মনও প্রশস্ত হয়ে যাবে। এখন এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি। হযরাত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুত্তাকী ও খোদাভীরুতে পরিণত হও। সবচেয়ে বড় আবেদ বা দাসে পরিণত হবে। স্বল্পে-তুষ্টতা অবলম্বন করে সবচেয়ে কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হবে। লোকদের জন্যে তা-ই চাইবে যা নিজের জন্য চাইবে তাহলে প্রকৃত মু'মিনে পরিণত হয়ে যাবে। নিজের প্রতিবেশির সাথে উত্তম আচরণ কর। প্রকৃত মুসলমানে পরিণত হয়ে যাবে। কম হাস। কেননা, অধিক হাসি অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয় (সুনানে আবি দাউদ কিতাবুয্ যাকাত)। অতএব এ হাদীসে তাকওয়ার পর দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তা হলো স্বল্পে-তুষ্টতা। স্বল্পে-তুষ্টতা অবলম্বন করো। কেননা, স্বল্পে-তুষ্টতা তোমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপরায়ণ করে দেবে। আর তোমরা কৃতজ্ঞপরায়ণ বান্দাতে পরিণত হয়ে গেলে আল্লাহ্‌তাআলা তখন বলেন, তোমরা আবার আমার অনুগ্রহগুলো আরও অধিক লাভ করবে। মু'মিনের কাজ তারা যেন পূর্ণ পরিশ্রমের সাথে নিজেদের কাজের প্রতি মনোযোগ দেয়। সমস্ত সহজলভ্য উপকরণাদি ব্যবহার করে এবং পরে যা কিছু লাভ হয় তাতে তুষ্ট হয় ও আল্‌হামদুলিল্লাহ্ পড়ে তখন আল্লাহ্‌তাআলা নিজের অনুগ্রহ দিয়ে এমনভাবে ভূষিত করেন যে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। আর কখনও কখনও কোন কোন লোকের নিজের পছন্দমত কাজ বা মনোমত বেতন লাভ হয় না আর এ অবস্থা পাকিস্তান প্রভৃতি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও রয়েছে এবং এখানে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও রয়েছে। আজকাল বিশ্বের যে অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পছন্দমত বা মান অনুযায়ী কাজ পাওয়া যায় না। কেননা, বেকার সমস্যাও প্রকট আকার ধারণ করেছে। অতএব এমতাবস্থায় আমরা যে কাজই পেয়ে থাকি তা করা বাঞ্ছনীয়। আর আল্লাহ্‌তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। 'নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল'। তাহলে পরে আল্লাহ্‌তাআলা ধীরে ধীরে কল্যাণ দিতে থাকেন। আমার কাছে অনেক লোক পরামর্শের জন্যে আসেন তখন আমি যাকেই এ পরামর্শ দিয়েছি -যে কাজই পাওয়া যায় তা করতে থাক। তাই আগে যে বেকার ছিল এখন কোন না কোন কাজে লেগে গেছে। আবার কখনও কখনও এটাও হয়ে থাকে, এ কাজে লেগে যাবার পড়ে সে অন্য কোন ভাল কাজ খোঁজ করতে থাকে আর স্বল্পে-তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্‌তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দাতে পরিণত হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহ্‌তাআলা এমন লোকদের জন্যে আরও ভাল কাজের উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়ে থাকেন এবং ভাল চাকুরী মিলে যায়।

একটি হাদীসে এসেছে। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, স্বল্পে-তুষ্টতা এমন একটি প্রতিদান যা শেষ হয় না (রিসালা কাশীরিয়্যর বাবুল কানায়াৎ, পৃষ্ঠা-২১)।

কখনও কখনও মানুষ মনে করে, আমার এটাও চাই সেটাও চাই কিন্তু স্বল্পে-তুষ্টতার অভ্যাস গড়ে উঠলে যেগুলোকে সে আগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতো, এসব জিনিষের কোন গুরুত্ব থাকেন না। এভাবে সঞ্চয়ের অভ্যাসও সৃষ্টি হয়ে যায়। আর একজন আহমদীর সঞ্চয়ের অভ্যাস সৃষ্টি হলে আল্লাহ্‌র ফযলে তখন এর ফলে তার আর্থিক কুরবানীরও অভ্যাস সৃষ্টি হয়। আবার একটি পুণ্যের ফলে অন্যান্য পুণ্য জন্ম নিতে থাকে। কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যে অতি মাত্রায় কৃপণ সে তো কেবল টাকার পাহাড় গড়ার জন্যে টাকা-পয়সা জমায়। সে-ই কেবল ব্যতিক্রম।

আবার আর একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালাম বলেছেন, "খরচ করার বেলায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন আর মিতাচার অর্ধেক জীবনোপায় এবং লোকদের সাথে ভালবাসার আচরণ অর্ধেক বুদ্ধি ও উত্তমভাবে প্রশ্ন করা জ্ঞানের অর্ধেক" (বায়হাকি ফী শোয়াবিল ঈমান, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪৩০)।

অতএব দেখুন এ হাদীস অনুযায়ী মধ্যম পন্থা অবলম্বন আর নিজের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার অবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ করেই এবং মিতাচারের সাথে ব্যয় করার মাধ্যমেই নিজের অর্ধেক অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়া যায়।

আবার হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর রিযওয়ানুল্লাহে আলায়হিম কর্তৃক বর্ণিত। "যখন কারও জীবনোপকরণ এতটা যে, কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটে আর এমতাবস্থায় আল্লাহ্তাআলা তাকে স্বল্পে-তুষ্টতা দান করেছেন সে সফলতা লাভ করেছে" (তিরমিযী, কিতুবুয্ যুহদ)।

অতএব দেখুন স্বল্পে-তুষ্টতা অবলম্বনকারীদের জন্যে সু-সংবাদ। এজন্যে কম বিত্তবান লোকদের জন্যেও এটা কোন লজ্জার বিষয় নয়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হলে সফলতাও আপনার করায়ত্ত।

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আদম সন্তানের কাছে এক উপত্যকা পরিমাণ সোনা থাকলেও (যে ব্যক্তি স্বল্পে-তুষ্ট নয় এবং লালসায় ডুবে থাকে তার বেলায় এটা প্রযোজ্য) সে আর এক উপত্যকা আকাঙ্ক্ষা করে। মাটি ছাড়া আর কিছু তার মুখ ভরতে পারে না। আল্লাহ্তাআলা তওবাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন" (সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুয্ যুহদ)।

অতএব আঁ হযরত (সঃ) স্বল্পে-তুষ্ট নয় এমন ব্যক্তির চিত্র এভাবে এঁকেছেন। লোভী ব্যক্তি তো এ চেষ্টাই করে যেন পৃথিবীর সব কিছু তার আয়ত্তে এসে যায় আর তখনও তার লোভের উপশম হয় না। যে পর্যন্ত সে জীবিত থাকে এ লোভ-লালসাই তাকে এ পৃথিবীতেও জাহান্নামে বসবাস করতে বাধ্য করে। কেননা, এত বেশি লোভ-লালসা তাকে অবশ্যই দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে রাখে। অতএব মু'মিনকে এসব বিষয় থেকে সুরক্ষা লাভ করা উচিত আর কখনও এসব চিন্তায় পেয়ে বসলে নিজেকে নিজে পবিত্র করার লক্ষ্যে আল্লাহ্তাআলার দরবারে নিবিষ্ট চিত্তে বিনত হওয়া আবশ্যক। মানুষ আল্লাহ্তাআলার দরবারে নিষ্ঠার সাথে বিনত হলে, তওবা ইস্তিগফার করলে আল্লাহ্তাআলা কবুল করে থাকেন।

কোন কোন লোক নিজের ভাল ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যের অর্থের (লোভাতুর) প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকে। আর স্বল্প অভিজ্ঞ লোক নিজের বোকামীর কারণে অধিক অর্থ উপার্জনের লালসায় এমন সব লোকের খপ্পরে পড়ে যায়। অবশেষে নিজের টাকা-পয়সাও খুইয়ে বসে। পরে নেযামে জামাতকে লিখে থাকে বা আমাকে লিখে থাকেঃ আমি অমুক আহমদীকে এভাবে এত টাকা দিয়াছিলাম অথচ সে সব টাকা মেরে দিয়েছে আর এখন আমি কপর্দকহীন হয়ে গেছি। অতএব আমাকে সাহায্য করা হোক এবং আমার অর্থ ফিরে পাবার ব্যবস্থা করা হোক।

তাই এমন লোকদের চিন্তা করা আবশ্যক, আসলে কি এ ব্যবসা এভাবে হতে পারে কি পারে না অথবা নাকি কেবল কেউ আষাঢ়ের গল্প শুনিয়ে তোমাদের কাছ থেকে পয়সা ও অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। স্বল্পে-তুষ্ট যদি হতে আর কমও লাভ করতে তাহলে কম পক্ষে প্রথম অবস্থার সৃষ্টি হতো না বরং নিজের পুঁজি কয়েকগুণ বেশি হয়ে যেতে পারতো।

এরপর যে অর্থ নষ্ট হয়ে গেছে, লাভ তো দূরের কথা অনেক টাকাই নষ্ট হলো, আসল পুঁজিও নষ্ট হলো। কিন্তু সাথে সাথে যারা এভাবে ব্যবসায়ের লোভ দেখিয়ে অন্যের অর্থ হাতিয়ে নেয়, আর ব্যবসায়ে গন্ডগোল বাঁধিয়ে অন্য ব্যক্তির বিশ্বস্ততায় অর্থ খাটায়, অন্যের নামে কাগজ-পত্র বানায়, মিথ্যা বর্ণনা দেয়, আর অন্যদেরকে তাদের সম্পত্তি বা টাকা-পয়সা থেকে বঞ্চিত করে, আমি সে সব আহমদীকেও বলছি, তোমাদেরও খোদাকে ভয় করা উচিত। দুনিয়ার প্রতি এতটা লোভ করা হয়েছে। স্বল্পে-তুষ্ট যদি হতো, অনেক ধনী হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি ও তাঁর ভয় দৃষ্টিপটে রাখতো তাহলে কখনও এমন কাজ করত না। জামাতের সেবা করা থেকে বঞ্চিত হতো না। আর নিজের সমাজে লজ্জা পেত না। আমরা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ পবিত্র কালাম জানার পরেও, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন বা নসীহত করেছেন, প্রত্যেক আহমদী শিশু এটা জানে, আহমদী সমাজে এ কথা সব সময় বলা বলি হয়ে থাকে, সব সময় আর্থিক লেনদেন বা পার্থিব বিষয়াদিতে নিজের চেয়েও ওপরের লোকদের দিকে তাকাবে না বরং নিজের চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর প্রতি দেখ। এটা আল্লাহ্তাআলার নেয়ামত। একে তুচ্ছ জ্ঞান করো না আর কৃতজ্ঞ হও একথা সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী"(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড-২, পৃষ্ঠা: ২৫৪, বৈরুতে মুদ্রিত)।

এর পরেও আমরা দুনিয়াদারীতে নিমগ্ন। অর্থাৎ এ হাদীসের অর্থ এই, নিজের চেয়ে ধনীকে দেখে লোকেরা আল্লাহ্তাআলার শোকরিয়া আদায় করে না আর লোভ এটাই হয়ে থাকে যে, তার টাকা-পয়সা যদি আমার হাতে এসে যেত বা কারও কাছে সামান্য টাকা-পয়সা হলেও তা দেখেও কোন কোন লোকের লোভ বেড়ে যায়। তাই আমরা যদি এ উপদেশগুলোর ওপর আমল করি তাহলে অনেক অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা পেতে পারি। আল্লাহ্তাআরা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোন বান্দার মাঝে খোদার পথের ধূলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও জমা হতে পারে না। আর কোন বান্দার অন্তরেই ঈমান ও লালসা একত্র হতে পারে না' (সুনানে নিসাঈ, কিতাবু য্যুহ্দ)।

অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে দুঃখ-কষ্ট বরণকারী কখনও জাহান্নামকে দেখবে না। জাহান্নামের ধোঁয়াও কখনও তার কাছে পৌছুবে না। আর যার অন্তরে সুদৃঢ় ঈমান রয়েছে, পোক্ত ঈমান রয়েছে, সে মু'মিন হলে সে কখনও পার্থিব ব্যাপারে লোভী হতে পারে না।

একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে-ব্যক্তি আন্তরিক স্বস্তি ও দৈহিক সুস্থতার সাথে সকালে ওঠে আর তার কাছে এক দিনের খাবার থাকে সে যেন সারা বিশ্বকে জয় করে নিয়েছে। তার পুরস্কারের সবটা তার লাভ হয়ে গেছে" (তিরমিযী, কিতাবুয্ যুহদ) এটা স্বল্পে-তুষ্ট হলেই লাভ হতে পারে।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ আলায়হিস সালাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'মানুষ যতটা (পার্থিব) আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারে ততটাই তার উদ্দেশ্য পুরো হয়। (পার্থিব) আকর্ষণকারীর বুকে আগুন থাকে আর সে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হতে থাকে। পার্থিব আকর্ষণ মুক্ত হলে এ পার্থিব জীবনেও এটাই আরামদায়ক। কথিত আছে, এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে

যাচ্ছিল। পথে এক ফকীর বসে ছিল। সে কষ্টে-সৃষ্টে নিজের সতর ঢেকে রেখেছিল। সে লেঙ্গট বা জাঙ্গিয়া পরে থাকবে। সে (অর্থাৎ ঘোড়সওয়ার) তাকে বললো, 'সাঈ জি! ভাল তো'? ফকীর বললো, 'যার সব আকাঙ্ক্ষা পুরো হয়ে গেছে তার অবস্থা কী হতে পারে?' সেই ঘোড়সওয়ার আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললো, 'তোমার সব আকঙ্ক্ষা কিভাবে পুরো হয়ে গেলো?' ফকীর বললো, 'যখন সব আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে দিয়েছি তখন যেন সব লাভ হয়ে গেছে।' অতএব হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'শিক্ষার বিষয় এই, যখন সেসব লাভ করতে চায় তখন দুঃখ-কষ্টই বাড়ে কিন্তু যখন স্বল্পে-তুষ্ট হয়ে সব কিছু ছেড়ে দেয় তখন যেন সব কিছু লাভ হয়ে যায়' (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২, নতুন সংস্করণ)।

একটি বর্ণনা আছে। হে আদম সন্তান! তুমি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ যদি খোদার মুখাপেক্ষী বান্দা ও ধর্মের কাজে ব্যয় কর তাহলে এটা তোমার পক্ষে কল্যাণজনক হবে-আর তুমি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ অভাবীদের উদ্দেশ্যে ব্যয় না কর তাহলে পরিশেষে এটা তোমার পক্ষে অকল্যাণজনক হবে। তোমার কাছে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ না থাকে বরং এতটাই ধন-সম্পদ থাকে যা তোমার মৌলিক চাহিদাগুলো পুরো করে সেক্ষেত্রে তুমি যদি ব্যয় না কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে নিন্দা করবেন না। আর ব্যয়ের সূত্রপাত তাদের কাছ থেকে আরম্ভ করো তোমরা যাদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত (তিরমিযী)।

আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহে জামাতেও এমন সব ধনী ব্যক্তি রয়েছেন যারা প্রাণ খুলে নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে লাযেমী চাঁদা বা অন্যান্য অঙ্গীকারকৃত নিয়মিত চাঁদা বা তাহরীকগুলোর ক্ষেত্রে চাঁদা আদায় করে থাকেন। এরপর মসজিদ নির্মাণের জন্যে, হাসপাতাল নির্মাণের জন্যে বা অন্যান্য জামাতী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চাঁদা দিয়ে থাকেন। এরা সেই সব লোক যাদের দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা নেই বরং লোভ-লালসা থাকলে তা কেবল এ জন্যে যেন খোদা সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাঁর জামাতের জন্যে ব্যয় করার জন্যে যত বেশি সুযোগ পেতে পারে তা যেন লাভ করে। আল্লাহ্ করুন জামাতের এমন সব লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকুক। এদের মাঝে স্বল্পে-তুষ্টতা থাকুক। কুরবানীর আত্মা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্তাআলাকে লাভ করার লালসাও থাকুক।

আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহে জামাতেও এমন সব ধনী ব্যক্তি রয়েছেন যারা প্রাণ খুলে নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে লাযেমী চাঁদা বা অন্যান্য অঙ্গীকারকৃত নিয়মিত চাঁদা বা তাহরীকগুলোর ক্ষেত্রে চাঁদা আদায় করে থাকেন। এরপর মসজিদ নির্মাণের জন্যে, হাসপাতাল নির্মাণের জন্যে বা অন্যান্য জামাতী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চাঁদা দিয়ে থাকেন। এরা সেই সব লোক যাদের দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা নেই বরং লোভ-লালসা থাকলে তা কেবল এ জন্যে যেন খোদা সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাঁর জামাতের জন্যে ব্যয় করার জন্যে যত বেশি সুযোগ পেতে পারে তা যেন লাভ করে।

এ বর্ণনায় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলয়হে ওয়া সাল্লামের অনাড়ম্বরতার দৃষ্টান্ত দেখুন! হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঘরে কেমন থাকতেন? তখন তিনি (রাঃ) বললেন, 'সাধারণ মানুষের মত থাকতেন। ঘর-গেরস্তের কাজে পরিবারের সকলকে সাহায্য করতেন আর নিজের কাজ-কর্মও নিজে করতেন' (তিরমিযী, কিতাবুল্ আযান)।

একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত নু' মান বিন বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আজ লোকদের কাছে কত ধন-দৌলত ও জায়গা-জমি! হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) একথা বর্ণনা কতে গিয়ে [হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে যথেষ্ট প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়েছিল] বলেন, 'আমি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এমন অবস্থায় দেখেছি, সারা দিন অভুক্ত থাকার পরও তাঁর এতটা পরিমাণ নিম্নমানের খেজুরও মিলতো না যাতে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারতেন!' (সহীহ্ মুসলিম)।

হযরত সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, নবুওয়তের পরে জীবনে নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ময়দার আটা চোখে দেখেন নি। হযরত সাহল বিন সা'দ বলেন, যখন থেকে আল্লাহ্তাআলা তাঁকে নবী বানিয়েছেন তখন থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত চালা বা মিহি আটা চোখে দেখেন নি। জিজ্ঞেস করা হলো, মিহি চালা ছাড়া আটা আপনারা খেতেন কিভাবে? তখন তিনি (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা (যাতার) চাকি পিষতাম আর আটায় মুখের ফুক মারতাম তখন কিছু ভুষি উড়ে যেতো। যেগুলো মোটা মোটা থাকতো সেগুলো এথেকে উড়ে যেতো আর বাকীটা দিয়ে রুটি তৈরী করে খেয়ে নিতুম (সহীহ্ বুখারী)।

তাই একবার নরম রুটি খাওয়ার সময় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর চোখে পানি এলো, নরম রুটি গলা দিয়ে নামছিল না। কেউ জিজ্ঞেস করলো, কারণ কি? তিনি বল্লেন, আমার মনে পড়লো, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময় এটা পাওয়া যেতো না আর তিনি সব সময় শক্ত রুটি খেতেন।

উম্মে সা'দ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে এলেন। 'আমি সেখানে বসেছিলাম। হুযূর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন খাবার আছে কি?' হযরত আয়েশা (রাঃ) বল্লেন, 'আমাদের কাছে রুটি, খেজুর ও সিরকা আছে।' রসূল করীম (সাঃ) বল্লেন, 'সিরকা তো খুবই উত্তম তরকারী'। এতে অনাড়ম্বরতা ও স্বল্পে-তুষ্টতা দুটোই ছিল। পরে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ্! সিরকাতে কল্যাণ দান কর। এটা আমার আগেরকার নবীদেরও খাবার ছিল। যে ঘরে সিরকা রয়েছে তা পরমুখাপেক্ষী নয়' (ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল আত্বআমাহ্)।

কিন্তু আজকালকার (রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী) সিরকাতো পেট খারাপ করে ফেলে। আসল সিরকা হওয়া আবশ্যক। স্বল্প-তুষ্টতার এ মান বা স্তর আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আমরা আজকাল ভাল ভাল খাবার খাওয়ার পরেও এতে লবণ বেশি , এতে মরিচ কম বা এতে মরিচ বেশি বলে তামাশা করতে থাকি। এর হাজারও রকম দোষ বের করতে লেগে যাই। এ না করে, এ যুগে আমরা এসব খাবার পাচ্ছি! এই বলে আল্লাহ্তাআলার শোকরিয়া আদায় করুন। যেভাবে আমি আগেই বলেছি, আজকাল লোকেরা শুধু সিরকা খায় না। আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহের শোকরিয়া আদায় করা আবশ্যক। এ থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। কিন্তু শোকরিয়া আদায় করতে গিয়ে শোকরিয়ার আবেগ আগের চেয়ে অধিক বাড়ানো দরকার।

হযরত আব্বাস বিন সালাম (রাঃ) বলেন, 'আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি রুটির একটি টুকরার ওপর

খেজুর রেখে ছিলেন আর বলছিলেন, এ খেজুর হলো এই রুটির তরকারী (আবূ দাউদ কিতাবুল ঈমান)।

এ হাদীসের দৃষ্টান্ত এ যুগে তাঁর (সঃ) সত্যিকারের গোলাম হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর জীবনেও পরিদৃষ্ট হয়। একবার তিনি বল্লেন, "এক বছরেরও অধিক সময় কেটে গেছে আমি মাংসের মুখ দেখি নি। অধিকাংশ সময় মিস্‌সী রুটি অর্থাৎ ডালের সাথে আটা মিশিয়ে তৈরী মোটা রুটি বা আচার অথবা ডালের সাথে খেয়ে নিতাম। তিনি বলেন, আজও আচারের সাথে রুটি খেয়েছি" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২০০, নতুন সংস্করণ)।

রুটি বলতে কী বুঝাতো! চার আঙ্গুল প্রশস্ত রুটির একটি টুকরো। এটাই তিনি খেয়ে থাকতেন। আবার আরও একটি হাদীস রয়েছে। এটা আরও উদ্বিগ্ন করে তোলে। আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কতটা স্বল্পে-তুষ্ট ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন! কেবল তিনিই নন বরং তাঁর পরিবারের লোকেরাও তাঁকে অনুসরণ করতেন।

হযরত উরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে ভাতিজা! আমরা দেখেছি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ঘরে দু'মাস ধরে চুলো জ্বলেনি। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে খালা! তাহলে আপনারা কী খেয়ে বেঁচে রয়েছিলেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা খেজুর খেতাম আর পানি পান করতাম। কেবল এটা ছাড়া যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনসারী প্রতিবেশীর দুগ্ধদানকারী পশু ছিল আর তিনি রসূলে করীম (সঃ)-কে দুধ সরবরাহ করে থাকতেন। তিনি আমাদেরকে তা পান করতে দিতেন (বুখারী, কিতাবুল জুমুআহ্)।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর যাঁতা পিষার ফলে হাতে ব্যথা হয়ে গেল আর এসব দিনে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কয়েকজন কয়েদী এসেছিল। হযরত ফাতিমা হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন; কিন্তু সাক্ষাৎ করতে পারলেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর আসার কারণ বলে গেলেন। হুযূর (সঃ) বাইরে থেকে এলে হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর আসার কথা বললেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এর পর হুযূর (সঃ) আমাদের ঘরে আসলেন, আমরা বিছানায় শুয়ে ছিলাম। হুযূর (সাঃ)-এর আসার কারণে আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, উঠনা শুয়ে থাক হুযূর (সঃ) আমাদের কাছে বসে গেলেন। এমন কি হুযূর (সঃ)-এর পায়ের শীতলতা, হযরত আলী (রাঃ)-বলেন, আমি আমার বুকে অনুভব করলাম। পরে তিনি বল্লেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের প্রার্থিত জিনিস থেকে উত্তম জিনিসের কথা বলব না? (আর তা হলো এই) তোমরা যখন ঘুমুতে যাবে তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবর বলবে, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্ বলবে এবং ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্ বলবে। এটা তোমাদের জন্যে একটি কাজের লোকের চেয়ে উত্তম অর্থাৎ এসব কথার বদৌলতে আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদেরকে কল্যাণ দান করবেন আর এ ধরনের চাওয়া থেকে মুক্তি পাবে। আজও প্রত্যেক অভাবীর এ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত (হাদীকাতুস্ সলেহীন)।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর বিয়ে উপলক্ষ্যে নবী করীম (সঃ) তার মৌলিক প্রয়োজনের মাত্র সামান্য কয়েকটি জিনিসই দিয়েছিলেন আর তা ছিলো এই; একটি রেশমী চাদর, আটা পেষার যাঁতা, চামড়ার ছোট থলে, ২টি কলসী। তিনি হযরত ফাতিমাকে এসব উপহার দিয়ে ছিলেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, প্রথম খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা, বৈরুত মুদ্রিত)।

আজকাল বিয়ে-সাদীতে এত অযথা ব্যয় করা হয় যার কোন হিসেব নেই। পাকিস্তান, হিন্দুস্তান প্রভৃতি দেশেও আর ইউরোপ এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশেও। এখনতো কোন কোন লোক এ সম্পর্কে বলা শুরু করেছে। এদিকে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। একে তো উপঢৌকনের ব্যস্ততা রয়েছে। অলংকার তৈরীর ব্যস্ততা, আবার নিমন্ত্রণে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এবং নাম ফুটানোর ব্যস্ততা আর যে হতভাগারা করতে পারে না, স্বয়ং যদি নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী করতে পারে তো ঠিক আছে কিন্তু যারা করতে পারে না এর ওপরে আবার কল্প-কাহিনী তৈরী করতে থাকে যে, ডাকা হয়েছিল, সেখানে এটা ছিল, সেটা ছিল আবার কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন নামে রুসুম-রেওয়াজ অব্যাহত থাকে এবং দাওয়াত দেয়া হয়। দাওয়াত তো কেবল একটিই যেমন দাওয়াতে ওলীমা (বৌভাত)। ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী এটাই আমাদের দৃষ্টিতে আসে। এছাড়া তো যাদের সামর্থ্য নেই লোক দেখানের জন্যে দাওয়াতের ব্যবস্থা তো করাই উচিত নয়। আর কখনও নিজের ওপর বোঝা চাপানো উচিত নয়। অবশ্য যখন অতিথি আসে সাদা মাটা অতিথি সেবা অবশ্য কর্তব্য। তা করা যেতে পারে। আবার যার সামর্থ্য রয়েছে সে ব্যয় করে থাকে। যার সামর্থ্য কম, তার কর্জ করে লোকের দেখা দেখি নিজের ওপর বোঝা চাপিয়ে পরে সাহায্যের জন্যে দরখাস্ত করা উচিত নয়। যাদের সামর্থ্য কম তাদের সব সময় যতটা কম ব্যয় করে পারা যায় তা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, তারা আল্লাহ্‌র নবীর সুন্নতের ওপরে আমল করছে। এছাড়া তাদের হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।

জামাতে 'মরিয়ম সাদী ফান্ড' নামে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'(রাহেঃ) একটি পরিকল্পনা আরম্ভ করেছিলেন যেন অভাবী মেয়েদের বিয়ের খরচ বা তহবিল যোগান দেয়া যেতে পারে। অতএব এথেকে মোটামুটি সন্তোষজনক একটি পরিমাণ অর্থ জামাত দিয়ে দেয়; কিন্তু এতেও অর্থ কম বলে কোন কোন লোকের পক্ষ থেকে দাবী এসে যায়। আমাদের এটাও ব্যয় করতে হয়। আমাদের তাতেও ব্যয় করতে হয় অথচ সেগুলো সবই নিষ্প্রয়োজনীয়। এগুলো ছাড়াও কাজ চলতে পারে। তাই এসব লোকদেরকেও আমি এটাই বলবো, জামাত ইনশাআল্লাহ্ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আহমদী মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, তাদের প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টা করবে। বিয়ের প্রসঙ্গে যা কিছু সম্ভব, তা করা হবে কিন্তু তাদের পিতা মাতারও নিজেদের মাঝে স্বল্পে-তুষ্টতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ সৃষ্টি করা আবশ্যক।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজের অতি নিকটের লোকদের মাঝে কিভাবে স্বল্পে-তুষ্টতার উচ্চ মান সৃষ্টির চেষ্টা করতেন, এখন তা আমরা দেখবো।

হযরত আমর বিন তাগলিব (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সমীপে অনেক ধন-সম্পদ ও কয়েদী আনা

হয়। তিনি এগুলোকে বন্টন করেন। কোন লোককে কিছুই দিলেন না। তিনি জানতে পারলেন, যেসব লোক কিছুই পায়নি সম্ভবত হুযূর (সঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এই ভেবে তারা খুবই দুঃখিত। এতে তিনি (সঃ) বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। আল্লাহ্‌তাআলার প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করলেন। পরে বল্লেন, আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, কখন কখনও আমি কোন কোন লোককে দিয়ে থাকি আবার কাউকে দিই না; কিন্তু যাকে দিই না সে আমার কাছে যাকে দিই তার চেয়ে খুবই প্রিয় ও স্নেহের পাত্র। এর তাৎপর্য এই, আমি কোন কোন লোককে এজন্যে দিই, কেননা, তাদের প্রাণে ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা রয়েছে। আর অন্যদের সম্বন্ধে আমার এ আস্থা ও স্বস্তি লাভ হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাদের অন্তরে মঙ্গল, অভাবমুক্ততা ও আত্ম-তুষ্টি রেখেছেন। আর আমর বিন তাগলিবও তাদের অন্যতম। আমর বলেন, তাঁর (সঃ) এ কথা শুনে আমি এত আনন্দিত হলাম যে, রক্তিম বর্ণের উট পেলেও আমার এতটা আনন্দ লাভ হতো না।

এ যুগেও এমন এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত তো অনেকেই পাওয়া যেতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত আমার দৃষ্টিতে রয়েছে। কাদিয়ানে একবার অনেক অতিথির সমাগম হয়। হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব দারুয্ যিয়াফতের ইনচার্জ ছিলেন। খাবার ছিল না, এমন কি বাবুরচিদের জন্যেও খাবার ছিল না। কেবল এক ব্যক্তির খাবার রয়ে গিয়েছিল। আর দু'জন বাবুরচি এমন ছিল যারা খাবার খায়নি। হযরত মীর সাহেব বল্লেন, অমুককে খাবার দিয়ে দাও। আর অমুককে অপেক্ষা করতে বল। শয়তান তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যে সব স্থানেই মজুদ থাকে। এক ব্যক্তি ছিল। সে অন্যের কাছে গিয়ে বললো, একজনের খাবার ছিল মীর সাহেব তা তোমাকে না দিয়ে অমুককে দিয়েছেন। তার খুবই অন্ত দৃষ্টি ছিল। সম্ভবত এ হাদীসও তার দৃষ্টিপটে ছিল। সে বললো, মীর সাহেব জানতেন, তাকে খাবার না দেয়া হলে সে আপত্তি করবে আর আমাকে না দিলে কোন ইতর বিশেষ হবে না। আমি এমন কোন কথা বলবো না। কেননা, মীর সাহেবের সাথে আমার ভাল সম্পর্ক রয়েছে।

অনাড়ম্বরতা, স্বল্পে-তুষ্টতা এবং কারও বোঝা না হয়ে থাকার ব্যাপারে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে এতটা তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিতেন যেন তাদেরকে কষ্টসহিষ্ণু বানিয়ে দিতেন। তাঁরা কারও কাছে হাত পাততেন না। নিজেরা কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করতেন।

আবার অনাড়ম্বরতা, স্বল্পে-তুষ্টতা এবং কারও বোঝা না হয়ে থাকার ব্যাপারে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে এতটা তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিতেন যেন তাদেরকে কষ্টসহিষ্ণু বানিয়ে দিতেন। তাঁরা কারও কাছে হাত পাততেন না। নিজেরা কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করতেন।

হযরত যুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের যে ব্যক্তি রশি নিয়ে জঙ্গলে যায়, সেখান থেকে লাকড়ীর বোঝা মাথায় উঠিয়ে বাজারে আসে আর তা বিক্রি করে দিনাতিপাত করে নিজের সম্ভ্রম ও স্বকীয়তা বাজায় রাখে সে খুবই সম্মানিত আর তার এ কর্মকান্ড লোকদের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে হাজার গুণে শ্রেয়। লোকদের কাছে সে হাত পাতলে তাকে কিছু দেয় কি না দেয় তা কে জানে (বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত)।

এ যুগে হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে কি দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন এখন আমরা তা দেখব আর এ দৃষ্টান্ত নিজের মান্যকারীদের কাছ থেকেও তিনি প্রত্যাশা করতেন অর্থাৎ সাদা-সিদা জীবন যাপন ও স্বল্পে- তুষ্টতা।

তিনি বলেন, আমরা সাদা-সিদা জীবন যাপন করে থাকি। আমাদের নীতির এটাও অন্যতম, যেসব আনুষ্ঠানিকতা আজকাল ইউরোপের জীবনকে উপভোগ্য করে রেখেছে অর্থাৎ জীবন যাপনের জন্যে আবশ্যিক হিসেবে মনে করে নেয়া হয়েছে আমাদের সমাজ এথেকে পবিত্র। আমরা রুসুম ও অভ্যাসের দাস নই। যা বাদ দিলে কোন কষ্ট বা পাপের সম্ভাবনা থাকে, এসব ছাড়া প্রত্যেক অভ্যাস থেকে আমরা মুক্ত। বাকী খাবার-দাবার ও চাল-চলনে আমরা অনাড়ম্বরতাই পছন্দ করে থাকি।

(মলফূযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৮, নতুন সংস্করণ)।

মোবাহাসা অমৃতসর উপলক্ষ্যে হযরত শেখ ইয়াকূব আলী ইরফানী সাহেব (রাঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতসরে থাকার একটি দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিলেন আর সেটা এত ছোট্ট ছিল যে, তাঁর হাটু পর্যন্ত নিচের শরীর মাটিতে ছিল; কিন্তু খুবই অনানুষ্ঠানিকতা ও অনাড়ম্বরতার সাথে শুয়ে ছিলেন, উঠে বসলেন। আমার ও মিয়া আল্লাহ্ দিন সাহেবের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আমি এ দুঃখের ঘটনাকে বর্ণনা করতে পারছি না।

চোখের সামনে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ঘটনা ভেসে উঠলো। একবার আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর বিশ্রাম করে ছিলেন। উঠলে পরে দেখা গেল পবিত্র সারা দেহে চাটাইয়ের দাগ। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কোন গদী বানিয়ে এনে দিব কি? বলা হলো, আমার দুনিয়ার কী প্রয়োজন ! আমার তো দুনিয়ার সাথে এমনই সম্পর্ক যেমন একটি আরোহী স্বল্প সময়ের জন্যে পথে কোন ছায়ায় একটু বসে নেয়। অবার সেখান থেকে উঠে সামনে চলতে থাকে। আমার ভালভাবে স্মরণ আছে; মিঁয়া আল্লাহ্ দীন সাহেব বল্লেন, এখানে কোন সতরঞ্জি বিছিয়ে দেব কি? তখন তিনি বল্লেন, না, ঘুমানোর জন্যে তো নয়, কেবল শুয়ে ছিলাম মাত্র। আরামে ব্যাঘাত ঘটে আর এখন আরামের দিন নয় (সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ): প্রণেতা: হযরত আব্দুল করীম সিয়ালকোটী সাহেব, পৃষ্ঠা-৩৩০)।

হযরত মুন্সী যাফর আলী সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার কর্ণেল আলতাফ আলী খান আমাকে বলেন, আমি একান্তে হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। কর্ণেল সাহেব কোট প্যান্ট পরা। দাড়ি মোচ মুড়ানো ছিল। আমি বললাম, জিজ্ঞেস করার কোন দরকার নেই, আপনি ভিতরে যান। আমরা বাইরে থেকে কাউকে ভিতরে যেতে দেব না। অতএব কর্ণেল সাহেব ভিতরে চলে গেলেন আর প্রায় আধঘন্টা পর্যন্ত হযরত সাহেবের কাছে একান্তে কাটান। কর্ণেল সাহেব যখন বাইরে আসলেন তখন চোখে পানি । আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কী কথা বললেন যে, এমন অবস্থা! অর্থাৎ কাঁদতে ছিলেন। তিনি বলতে থাকলেন, যখন আমি ভিতরে গেলাম তখন হযরত সাহেব নিজ মনে চাটাইয়ের ওপর বসেছিলেন। কিন্তু চাটাইয়ের ওপর হুযূর (আঃ)-এর হাঁটুই ছিল আর বাকী মাটিতেই বসে ছিলেন। আমি বললাম, হুযূর

মাটিতে বসে ছিলেন আর হুযূর এটা মনে করলেন, সম্ভবত আমি (অর্থাৎ কর্ণেল সাহেব) চাটাইয়ের ওপর বসাটা পছন্দ করি না। এজন্যে হুযূর (আঃ) নিজের পাগড়ী চাটাইয়ের ওপর বিছিয়ে দেন আর বলেন, আপনি এখানে বসুন, এটা দেখে আমার চোখে পানি আসে। আমি নিবেদন করি, যদিও আমি বিলেতে বাপ্তাইজ (Baptist) হয়েছি; কিন্তু এতটা বেঈমান হইনি যে, হুযূর-এর পাগড়ীর ওপর বসে যাব। হুযূর বলতে লাগলেন, কোন অসুবিধা নেই, কোন কষ্ট নেই আপনি বিনা আনুষ্ঠানিকতায় বসে যান। আমি হাত দিয়ে পাগড়ী সরিয়ে চাটাইয়ের ওপর বসে গেলাম। আমি আমার কথা বলতে আরম্ভ করলাম, আমি অনেক মদ খাই অন্যান্য পাপও করি। খোদা রসূলের নাম জানি না। কিন্তু এখন আমি আপনার কাছে খৃষ্ট ধর্ম থেকে তওবা করে মুসলমান হচ্ছি। কিন্তু আমি যে দোষে আক্রান্ত হয়েছি তা পরিত্যাগ করা কঠিন মনে হচ্ছে। হুযূর বললেন, ইস্তিগফার পড়তে থাক আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার অভ্যাস কর। আমি হুযূরের কাছে যতক্ষণ বসে ছিলাম আমার অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে আর আমি কাঁদতে থাকি। আর এমন অবস্থায় আমি অঙ্গীকার করি, আমি ইস্তিগফার ও নামায অবশ্যই পড়বো। তাঁর অনুমতি নিয়ে এসে গেছি। আমার প্রাণে এখনও সেই প্রভাব রয়ে গেছে (বর্ণনা মুন্সী যাফর আহমদ সাহেব (রাঃ), সংকলক : মালিক সালাহ উদ্দীন সাহেব, এম, এ , পৃষ্ঠা-৯৩-৯৪)।

আজকাল ছুরি কাঁটা দিয়ে খাবার একটি ফ্যাশন। বেশ, এতে কোন দোষ নেই। খাওয়া যায়। কিন্তু এ ফ্যাশনে অভ্যস্ত এখানকার লোকেরা যেহেতু বাম হাতে কাঁটা ধরে খেয়ে থাকে তাই বাম হাত দিয়ে খাওয়া হয়। এ প্রসঙ্গেও আহমদীদের ইসলামের যে শিক্ষা তা পালন করা বাঞ্ছনীয়। দজ্জালের প্রভাবে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। অথচ এর ব্যবহারে কোন ত্রুটি নেই।

আমি হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করে শুনাচ্ছি। তিনি ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ইসলামী শরীয়ত ছুরি-কাঁটা দিয়ে খেতে নিষেধ তো করে নি। অবশ্য লৌকিকতা করে কোন কথা বা কর্মের প্রতি জোর দিতে নিষেধ করেছে। এ মনে করে যেন সেই জাতির সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি না হয়ে যায়। নইলে এটা তো প্রমাণিত যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম চাকু দিয়ে মাংস কেটে খেয়েছেন। আর এ কাজটি এজন্যে করেছেন যেন উম্মতের কষ্ট না হয়। বৈধ প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এভাবে খাওয়া বৈধ কিন্তু একেবারে এর দাস বনে যাওয়া আর আনুষ্ঠানিকতা করা এবং খাবার অন্যান্য পদ্ধতিকে হেয় জ্ঞান করা নিষেধ। সেক্ষেত্রে পরে মানুষের অনুসরণের পালা আস্তে আস্তে এতটা পর্যন্ত পৌঁছে যায় যে, তারা তাদের মত পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া থেকে বিরত হতে থাকে- মান তাশাব্বাহা বি ক্বওমিন ফাহুয়া মিনহুম- এর অর্থ এটাই, আবশ্যকীয় মনে করে না করে নচেৎ কখনও বৈধ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এমনটি করা নিষেধ নয়। কখনও কখনও কাজের চাপ বেশি থাকে এবং বসে বসে লিখতে থাকতে হয় তখন বলে দেয়া হয়, টেবিলে খাবার দাও এবং এতে খেয়ে নেয়া হয় এবং নিচে সারিতে বসেও খেয়ে নেয়া হয়। চৌকির ওপরেও খেয়ে নেয়া হয়। তিনি বলেছেন, এ হাদীসে 'তাশাব্বা' অর্থ এটাই এ সীমারেখাকে অবশ্যকরণীয় ধরে নেয়া। নচেৎ আমাদের ধর্মের অনাড়ম্বরতা তো এমন একটি বিষয় যার প্রতি অন্যান্য জাতি ঈর্ষান্বিত আর আকাঙ্ক্ষা করে হায়, আমাদের ধর্মে যদি এমন থাকতো! আর ইংরেজরা এসবের প্রশংসা করেছে এবং অধিকাংশ নিয়ম-নীতি তারা আরবদের কাছ থেকে নিয়ে প্রয়োগ করেছে। কিন্তু এখন রুসুম পূজারী বাধ্য হয়েছে, ছাড়তে পারছে না' (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৭০, নতুন সংস্করণ)।

এখন আমি ওয়াকেফীনদের (উৎসর্গকারীদের) উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি পাঠ করছি। আজ তো আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহে জামাতের অবস্থা অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর জীবন উৎসর্গকারীদের জন্যেও জামাত সামর্থ্যানুযায়ী যতটা সুযোগ-সুবিধা পৌঁছানো যায় তা পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু জীবন উৎসর্গকারী ও এখন কোন কোন ওয়াকফে নও-ও এ বয়সে পৌঁছে গেছে এবং জামেয়াতে পাঠরত রয়েছে। কেউ কেউ অন্যান্য কলেজে পড়ছে তাদেরকে হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর মূল্যবান বক্তব্য সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা কর্তব্য। এখন আমি তা পাঠ করছি।

তিনি বলেন, ' আমাদের এমন সব লোকের প্রয়োজন যারা শুধু কথায়ই নয় বরং কার্যত কিছু একটা করে দেখাবে। শিক্ষার মৌখিক দাবী কোন কাজ দেয় না। এমন হোক যেন গর্ব ও অহংকার থেকে পুরোপুরি পবিত্র হয় আর আমাদের সংস্পর্শে থেকে বা কমপক্ষে আমাদের পুস্তকাদি বেশি বেশি পাঠ করে তাদের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন হয়। তবলীগের ক্ষেত্রে এমন সব ব্যক্তির পদচারণা আবশ্যক। কিন্তু এমন যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া ভার যারা নিজেদের জীবন এ পথে উৎসর্গ করবে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবারাও ইসলামের প্রচারের লক্ষ্য দূর-দূরান্তের দেশে পর্যন্ত যেতেন। এই যে চীন দেশ যেখানে কয়েক কোটি মুসলমান রয়েছে, এথেকে জানা যায় সেখানেও সাহাবাগণের কেউ কেউ পৌঁছে গিয়েছিলেন। এভাবে যদি ২০/৩০ জন লোক বিভিন্ন স্থানে চলে যায় (এখন তো আল্লাহ্তাআলা জামাতকে হাজার হাজার দিয়ে দিয়েছেন। এখন তো খুব শীঘ্র শীঘ্র তবলীগ হতে পারে) শত শত তো ময়দানে রয়েছে। আর হাজার হাজার ভবিষ্যতে আসছে, ইনশাআল্লাহ্তাআলা। কিন্তু যতক্ষণ এসব লোক আমাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ও স্বল্পে-তুষ্ট না হবে ততক্ষণ আমরা তাদেরকে পুরোপুরি দায়িত্ব দিতে পারি না। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ এমন স্বল্পে-তুষ্ট ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন যে, কখনও কখনও গাছের পাতা খেয়েই দিনাতিপাত করতেন' (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৮২, নতুন সংস্করণ)।

আমাদের এমন সব লোকের প্রয়োজন যারা শুধু কথায়ই নয় বরং কার্যত কিছু একটা করে দেখাবে। শিক্ষার মৌখিক দাবী কোন কাজ দেয় না। এমন হোক যেন গর্ব ও অহংকার থেকে পুরোপুরি পবিত্র হয় আর আমাদের সংস্পর্শে থেকে বা কমপক্ষে আমাদের পুস্তকাদি বেশি বেশি পাঠ করে তাদের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন হয়।

এ যুগেও কিছু দিন আগে আমাদের কোন কোন মোবাল্লেগ আফ্রিকায় গিয়েছেন আর তারা সামর্থ্যের স্বল্পতায় সাধারণ খাবার খেয়েই দিনাতিপাত করেছেন। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে সাদা-সিদা জীবন যাপন করার ও স্বল্পে-তুষ্টতা লাভের সৌভাগ্য দান করুন ।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল এর ১৪-২০মে, ২০০৪ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)।

অনুবাদ ঃ **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক

আহমদীয়া জামাত নির্মিত মসজিদগুলো ঐ মসজিদগুলোর মত হয় না, যেগুলো সাময়িকভাবে আবেগ তাড়িত হয়ে নির্মাণ করা হয়ে থাকে এবং যেগুলোর বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রতি বেশি দৃষ্টি দেয়া হয়ে থাকে। হযরত ইব্রাহিম হযরত ইসমাঈল (আঃ) যে দোয়ার মাধ্যমে বায়তুল্লাহ্ শরীফের (কা'বা গৃহের) কাজ আরম্ভ করেছিলেন, ঐ দোয়া দিয়ে আমাদের মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়ে থাকে।

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১০জুন ২০০৫ইং তারিখে ভেনকোভার শহরে (কানাডা) প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহার পরে হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারার ১২৮, ১২৯ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন ঃ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٨﴾
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٩﴾

আগামীকাল ইন্শাআল্লাহ্ আপনাদের মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। দীর্ঘদিন ধরে এখানে মসজিদের নির্মাণ কাজ হাতে নেয়ার চেষ্টা হয়ে আসছিল। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বাধার কারণে জমি থাকা সত্ত্বেও মসজিদের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। আল্লাহ্তাআলা নিজ অনুগ্রহে সমস্ত বাধা দূর করে দিয়েছেন। আল্হামদুলিল্লাহ্। যারা এ মসজিদ নির্মাণের প্ল্যান অনুমোদন লাভের জন্য বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন, চেষ্টায় শামিল হয়েছেন তাদের আল্লাহ্ পুরস্কৃত করুন। আহমদীয়া জামাত কর্তৃক নির্মিত মসজিদগুলো ঐ রকম হয় না যেগুলো সাময়িকভাবে আবেগ তাড়িত হয়ে নির্মাণ করা হয় এবং যেগুলোর বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রতি বেশি দৃষ্টি দেয়া হয়। যেখানে অভ্যন্তরীণ বা রূহানী সৌন্দর্যের প্রতি ততটা দৃষ্টি দেয়া হয় না। আমাদের মসজিদগুলো ঐ রকম নয়। আমাদের মসজিদের আসল সৌন্দর্য এখানে যারা নামায পড়েন তাদের দিয়ে সৃষ্টি হয়। এখানে যারা ইবাদত করে তাদের দিয়ে হয়। আমাদের মসজিদসমূহের ভিত্তি রাখা হয় ঐ দোয়াগুলো পাঠ করে যে সমস্ত দোয়া হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাইল (আঃ) আল্লাহ্র গৃহ নির্মাণের সময় পড়েছিলেন। আহমদীরা তো সে রকম মানুষ না যাদের সম্পর্কে 'ঈমানের উত্তাপ' ধারণকারী মানুষ বলা হয়েছে, যাদের অন্তর বহু বছরেও নামাযী হতে পারেনি। যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে মান্য করেনি তারা তো জানেও না যে, ঈমানের উত্তাপ কি জিনিস। তারা তো খবরও রাখে না যে, ঈমানের মাঝে কিভাবে তাপ সৃষ্টি হয়। তারা সব কিছুকেই খুবই হালকাভাবে গ্রহণ করে। তারা জানে না ঈমানের আলো কি? সুতরাং আপনাদের আছে এ সম্মান যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে মান্য করেছেন। ঈমানের এ অবস্থাকে ধরে রাখার জন্য নিজেদের নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) এর দোয়াগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখুন। তাহলে আপনারা আখেরীনদের অর্ন্তভূক্ত হতে পারবেন। হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) যে দোয়াগুলো পড়েছিলেন এর উল্লেখ রয়েছে এ আয়াতে (অনুবাদ নিম্নরূপ) ঃ

'এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল এ গৃহের ভিত্তি উঠাচ্ছিল (এবং দোয়া করছিল) 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ থেকে (এ সেবা) গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী; হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার কাছে আত্মসমর্পনকারী কর এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও তোমার এক আত্মসমর্পনকারী উম্মত সৃষ্টি কর; এবং তুমি আমাদের ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি প্রদর্শন কর এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর, কারণ তুমিই পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী পরম দয়াময়।

সুতরাং আমরা এ মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে এ দোয়াই করব যে, **হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের এই ক্ষুদ্র কুরবানী কবুল কর, যা তোমার সামনে আমরা রেখেছি। তুমি নিজেই তো বলেছ যে, তুমি আমাদের দোয়া শোন। তুমি সর্বজ্ঞানী। তুমি আমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবই জান, তুমি আমাদের অতীতকেও জান, ভবিষ্যতকেও জান যে, কী হতে যাচ্ছে? তুমি আমাদের মনের মধ্যে কী আছে তা-ও জান? যদি আমাদের মনে কোন বক্রতা থেকে থাকে, তাহলে তা দূর করে দাও ! তুমি আমাদের কে হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল**

(আঃ)এর দোয়ার উত্তরাধিকারী কর। হে আল্লাহ্! যেভাবে তুমি উপরোক্ত উভয় বুযূর্গদের দোয়া শুনেছিলে আজ আমাদের দোয়াও শোন (কবুল কর)। তোমার এ গৃহের নির্মাণ কাজকে কবুল কর! হে আল্লাহ্! আমাদের বংশধরদের মধ্য হতে আমাদের সন্তানদের মধ্যে এমন মানুষ সব সময় যেন জন্ম নিতে থাকে যারা তোমার ইবাদত করবে।

হে আল্লাহ্! আজ পৃথিবীর মানুষ কামনা-বাসনার পেছনে পড়ে অন্ধ হয়ে গেছে। হে আল্লাহ্! এমন যেন না হয় যে, আমরাও দুনিয়ার পেছনে লেগে যাই। আমাদের পথ দেখাও। আমাদের হেদায়তের জন্য তুমি আজ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রূহানী সন্তান হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে পাঠিয়েছ এবং তাঁর দ্বারা নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছ, আমাদের কোন ভুলের কারণে আমরা যেন এর থেকে দূরে সরে না যাই। আমাদের বহু দূরের, বহু পরের বংশধরদের মধ্যেও এ নেয়ামতকে জারি রেখ। আমাদেরকে সব সময় শক্তি দাও, আমরা যেন তোমার দিকে ঝুঁকে থাকি, আমাদের সন্তানরাও। আমরা যেন তওবা করতে থাকি। তুমি আমাদের তওবা কবুল করো। আমাদের প্রতি কৃপা করো, তোমার অনুগ্রহের চাদরে আমাদেরকে ঢেকে রেখ। আমাদেরকে সব সময় তোমার ইবাদতকারী বানিয়ে রেখ। তোমার খেলাফতের পুরস্কার যেন সদা-সর্বদা আমাদের মাঝে কায়েম থাকে।

প্রত্যেক আহমদী যখন বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্‌র দরবারে বিনত হয়ে এ রকম দোয়া করতে করতে মসজিদ নির্মাণে অংশ গ্রহণ করবে এবং সাথে সাথে নিজ কর্ম দিয়ে নিজের ইবাদত দ্বারা এ সব মসজিদকে সুন্দর করে সাজাতে থাকবে, তখন আল্লাহ্‌তাআলাও তাঁর পুরস্কারসমূহ আমাদের দিতে থাকবেন। অতএব, আপনারা এদিক থেকে ভাগ্যবান যে, আপনারা প্রথম ইব্রাহীম (আঃ)কেও মেনেছেন; তিনি যে মহানবীর জন্য দোয়া করেছিলেন, যে দোয়া আল্লাহ্‌তাআলা কবুল করতঃ এক মহান নবী, মহাপবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে পাঠিয়েছেন তাঁকেও আপনারা পুরোপুরিভাবে মেনেছেন, তাঁর (সঃ) অগনিত ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ঈমান রেখে তাঁকেও (অনুবাদক– প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্‌দীকে) মেনেছেন। হুযূর (সঃ) এর আদেশ যে, তাঁর সংবাদ পেলে বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যদি তাঁর কাছে যেতে হয়-তবু যাবে' এবং তাঁকে আমার সালাম বলবে, (এ আদেশও পালন করেছেন)। কারণ সেই প্রতিশ্রুতি মসীহ্ ও মাহদী অন্ধকার যুগে আর্বিভূত হবেন যখন ইসলামের শিক্ষাগুলো সবাই একেবারেই ভুলে যাবে, ইসলামের কেবল নাম থেকে যাবে; তখন এই মহাপুরুষ 'জরিউল্লাহ' ইসলাম ধর্মকে পুনরায় দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অতএব , আমরা ভাগ্যবান যারা এই 'জরিউল্লাহ' কে মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমি যেমন পূর্বে বলেছি, 'জরিউল্লাহ' তো ধর্মকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবার কথা, এখন আমরা তাঁকে মেনে নেয়ার পর যদি আমাদের নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন না করি-, ইবাদত ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম যথাযথ সম্পাদন না করি, প্রথম যুগের মান্যকারীরা যে মাত্রা কায়েম করেছেন সেই মাত্রাকে আমরা ধরে না রাখি তাহলে আমাদের ঈমান কোন কাজে আসবে না। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে, এ যুগের এই মহাপুরুষকেও আল্লাহ্ ইব্রাহীম বলে সম্বোধন করেছেন। এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় এ ইব্রাহীম, তাঁর নিজ ইমাম ও মনিব এবং পরম মাননীয় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুগত হয়ে, আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করানোর জন্য, আমাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য, পবিত্র করার জন্য আধ্যাত্মিক ধনভান্ডার (রূহানী খাযায়েন) বিতরণ করবেন; যদি আমরা তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হই। কুরআন শরীফের আয়াত যা আমি আজ তেলাওয়াত করেছি- এখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর অবস্থানকে নমুণা স্বরূপ ধরে নেবার আদেশ দেয়া হয়েছে । এই অবস্থানকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর ভাষায় ব্যাখ্যা কবর। কিন্তু প্রথমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কের কথা বলছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

ওয়াত্তাখিযু মিম মাকামি ইব্রাহীমা মুসল্লা (অর্থ: তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান বানাও) এ আয়াত ইংগিত করছে যে, শেষ যুগে, যেদিন হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর উম্মত অনেকগুলো দলে বিভক্ত হয়ে যাবে তখন একজন ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করবেন; সেদিন ঐ দল (জামাত) মুক্তি পাবে যে দল সেই ইব্রাহীমকে মেনে নিবে।"

[আরবাইন, নং-৩, পৃ: ৩২: ; তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১ম খন্ড, পৃ: ৫৮৭)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, ওয়াত্তাখিযু মিম মাকামি ইব্রাহীমা মুসল্লা (অর্থ: তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান বানাও) এ আয়াত ইংগিত করছে যে, শেষ যুগে, যেদিন হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর উম্মত অনেকগুলো দলে বিভক্ত হয়ে যাবে তখন একজন ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করবেন; সেদিন ঐ দল (জামাত) মুক্তি পাবে যে দল সেই ইব্রাহীমকে মেনে নিবে।"

অতএব দেখুন, আমি পূর্বেও বলেছিলাম, আপনারা কত ভাগ্যবান যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে মেনেছেন। আপনারা ভাগ্যবান যে, শেষ যুগের ইব্রাহীমকে মান্য করে মুক্তি প্রাপ্ত ফের্কা হয়েছেন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন ঈমানের দাবী এই যে, আপনারা ঐ শিক্ষাকে মেনে চলবেন যে শিক্ষা নবী (আঃ) নিয়ে এসেছেন। মুক্তি কেবল মুখের কথায় হয় না যে, আমরা ঈমান এনেছি। বরং আল্লাহ্‌র কিছু বিধান রয়েছে। ঐ বিধান মোতাবেক ঈমানদার হলে মুক্তি লাভ হয়। আল্লাহ্‌তাআলা সকল আহমদীকে মুক্তি লাভের শক্তি দান করুন।

ঈমানের ঐ মাত্রা কিভাবে লাভ করা যায়? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন: 'ইব্রাহীমের মাকাম (অবস্থান) হতে নামাযের স্থান লাভ কর," এখানে মাকামে ইব্রাহীম বলতে এমন চারিত্রিক গুণাবলী বুঝায় যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক করার জন্য প্রয়োজন।' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ মত জীবন যাপন করা, আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত সব কিছু করা। হযরত (আঃ) আরো বলেছেন: 'আল্লাহ্‌র

ভালবাসা, নিজেকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করা, আল্লাহ্‌র মর্জিমত হয়ে যাওয়া, আল্লাহ্‌র সাথে পুরোপুরি বিশ্বস্থতা রক্ষা করা- এটাই প্রকৃত মাকামে ইব্রাহীম যা উম্মতে মুহম্মদীয়াকে প্রকৃতিগতভাবে এর ওয়ারীশ বা উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভালবাসা এবং নিজকে আল্লাহ্‌র আদেশের অধীন করে দেয়া, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর সাথে বিশ্বস্থতা রক্ষা করা, তাঁর আদেশসমূহ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করা; এটা যখন হবে- তখন এটাই এই উম্মতকে মাকামে ইব্রাহীমের উপর নিয়ে যাবে যা এর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আরো বলেছেন, " যে ব্যক্তি কে ইব্রাহীমের হৃদয় দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তাঁর আনুগত্য করাটাই স্বাভাবিক।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন নং-১ পৃ: ৬০৮, পাদটীকা নং-৩)]

অতএব, এটা হলো মাকামে ইব্রাহিম যার শিক্ষা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রত্যেক আহমদীকে এরই উপরে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান। প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে আল্লাহ্‌র ভালবাসা থাকবে। এমন ভালবাসা যার সামনে অন্য সকল ভালবাসা তুচ্ছ মনে হবে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র ভালবাসার কারণে শির্‌কের (আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা) বিরুদ্ধে এক মহাযুদ্ধ ঘটিয়েছিলেন। যার ফলে বিরোধীরা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর আপনজনকে বিনষ্ট হতে দেন নি। ফলে ঐ আগুন ইব্রাহীমের কোন ক্ষতি করেনি। আজ আমাদেরকে যাচাই করে দেখতে হবে। একদিকে আমরা নিজেদেরকে ইব্রাহীম (আঃ) এর বরকতের অংশীদার করতে চাচ্ছি; আমরা এ যুগের ইব্রাহীমকে মান্য করেছি এবং সকল প্রকার শির্‌ক এর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়েছি। কিন্তু নামাযের সময়- আমরা ছোট ছোট প্রতিমা সামনে রাখছি, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী ইত্যাদির অজুহাত দেখিয়ে অলসতা দেখাচ্ছি। এর কবল থেকে নিজেদের বের করে আনতে চাই না; অথবা যথেষ্ট চেষ্টা করছি না। যতটা চেষ্টা করা উচিৎ। কেবল মুখে বলা যে, 'হে আল্লাহ্! আমাদেরকে মাকামে ইব্রাহীম দান কর, এতে কোন উপকার হবে না; যতক্ষণ ঐ রকম আল্লাহ্‌র ভালবাসা আমাদের অন্তরে আমরা সৃষ্টি করব, যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর অন্তরে ছিল। যতদিন আমরা আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র আদেশের অধীন করে না দিব; যতদিন আমরা আমাদের সকল বিষয়াদি পুরোপুরি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীনে ছেড়ে না দিব; এবং যতদিন আমরা উন্নতমানের ইবাদতকারী না হব এবং নিজের মিথ্যা অহংকারকে বিসর্জন না দেব; যতদিন বংশ মর্যাদার অহমিকা পরিত্যাগ না করব; যতদিন আমরা এ আবর্তের মধ্যে চক্কর খেতে থাকব যে, আমি সৈয়্যদ, আমি মোঘল, বা পাঠান বা জাট বা আরায়ী , যতদিন আমরা এ সব শব্দের বাইরে বের হতে না পারব; যতদিন আমরা আমাদের মান মর্যাদার মাপাকাঠি আল্লাহ্‌র নির্দেশে 'তাকওয়া' কে না বানাব ততদিন আমরা কোন উপকার পাব না। হ্যাঁ যেদিন আমরা এসব করতে পারব সেদিন আমরা বলতে পারব যে, আমরা মাকামে ইব্রাহীমের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। সেদিন আমরা বলতে পারব যে, আমরা মাকামে ইব্রাহীম লাভ করেছি এবং আমাদের সকল বিষয়াদি আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করেছি। তখন আমরা বলতে পারব যে, আমরা আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বস্থতা রক্ষা করেছি এবং এ যুগের ইব্রাহীমের হাতে বয়আত করে যে, প্রতিজ্ঞা করেছি তা পালনও করেছি। সুতরাং যখন আমরা এই মানদন্ড অর্জন করতে পারব বা অর্জনের চেষ্টায় অগ্রসর হব তখন আমরা নিজেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর প্রিয়জনদের অর্ন্তভূক্ত মনে করতে পারব। নতুবা আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর দেহ-বৃক্ষের সবুজ ডাল পালা-বলে মনে করতে পারি না। বরং আমরা মরা ডাল পালা হব যা যে কোন সময় বাগানের মালির হাতে কাটা পড়বে। কারণ আমরা তো সেই পদমর্যাদা রক্ষা করছি না। , ঐ অবস্থানে অবস্থান করছি না, যার উপর অবস্থান গ্রহণের জন্য উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে আদেশ করা হয়েছে। অতএব এ যুগের ইব্রাহীমকে মান্য করে অর্থাৎ আঁহযরত (সঃ) এর খাটী প্রেমিক এবং প্রকৃত খাদেম হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কে মান্য করে নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনতেই হবে, নিজেদের অন্তরে ইব্রাহিমী গুণাবলী সৃষ্টি করতেই হবে। নিজেদের সকল কাজ কর্ম, সকল ইবাদতকে ঐ শিক্ষা অনুসারে সাজাতে হবে যার আদেশ খোদাতাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। নিজেদের মসজিদগুলোতে আল্লাহ্‌র তৌহীদের স্লোগান- দেয়ার সাথে সাথে, প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতার স্লোগানও দিতে হবে। ইবাদতের এই মাত্রা অর্জন না করে, সৎকর্মের এই মাত্রা অর্জন না করে, আমরাও ঐ স্থানেই অবস্থান করব যে স্থানে আজ আঁহযরত (সঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণীকে অমান্য করে মুসলমানেরা দাঁড়িয়ে আছে, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে অস্বীকার করেছে। তাদের মসজিদগুলো নামাযীদের দ্বারা পরিপূর্ণ মনে হয়, ভরা মনে হয়; কিন্তু সেখানে ঘৃনার স্লোগাণ এবং একে অপরের গলা কাটা ছাড়া অন্য কিছুই হয় না। সেখানে মসজিদের মিম্বর যে মোল্লার দখলে আছে সে মোল্লা অন্য ফের্কার বিরুদ্ধে গালমন্দ করা ছাড়া আর কিছুই করে না। সেসব মসজিদে যদি কোন ভদ্রলোক চলে যান তাহলে তিনি এই বলে উঠে আসেন, "মৌলভী সাহেব! আমরা তো ইসলামের শিক্ষা লাভের জন্য এসেছিলাম-গালমন্দ ও অশ্রাব্য কথা শুনতে আসি নি। যা হোক আজ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন- ঐ সব নামসর্বস্ব আলেমরা তাঁকে অমান্য করেছে-এমন কাজই তো করার কথা ছিল! কারণ আঁহযরত (সঃ) এর এররকম ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন-

"শিঘ্রই এমন দিন আসবে যখন ইসলামের কেবলমাত্র নাম ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না; অক্ষরগুলো ছাড়া কুরআনের আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সে যুগে মসজিদগুলো বাহ্যতঃ লোকে লোকারন্য থাকবে,

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র ভালবাসার কারণে শিরকের (আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা) বিরুদ্ধে এক মহাযুদ্ধ ঘটিয়েছিলেন। যার ফলে বিরোধীরা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর আপনজনকে বিনষ্ট হতে দেন নি। ফলে ঐ আগুন ইব্রাহীমের কোন ক্ষতি করেনি।

কিন্তু সেখানে হেদায়ত থাকবে না। তাদের আলেমরা আকাশের নিচে বসবাসকারী প্রাণীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে। তাদের মধ্য ফেৎনা সৃষ্টি হবে এবং তাদের মধ্যেই আবার ফেরত যাবে।" (মেশকাত, কিতাবুল ইলম্, ফসলুস সালেস; রওয়াত নং-২৭৬)।

কিন্তু আপনারা যারা একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে মেনে নিয়েছেন, ঐ গুহার দিকে ফেরত যাবেন না, যেখানে ঘন অন্ধকার। বরং সৎকর্মশীল হোন, পুণ্যকর্মের উপর দাঁড়িয়ে মসজিদগুলোকে কল্যাণ, মঙ্গল এবং আলোর মিনার বানিয়ে রাখুন।

আর একটি হাদীসে আছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের মসজিদে এই নিয়্যতে প্রবেশ করে যে, সে ভাল কথা শিখবে ও জানবে, সে আল্লাহ্র পথে জেহাদে অংশগ্রহণকারী বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি অন্য নিয়তে আসবে সে ঐ ব্যক্তির মত হবে যে কোন ভাল জিনিস দেখে কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে পারে না।" (মসনদ আহমদ বিন হাম্বল; ২য় খন্ড, পৃ: ৩৫০। বৈরুত থেকে প্রকাশিত)।

এমন লোকের জন্য মসজিদে আসা অকার্যকর। কারণ মু'মেনদের মসজিদ মোনাফেকদের বা ফেৎনা সৃষ্টিকারীদের জন্য হয় না।

আল্লাহ্ করুন, আমাদের প্রত্যেকে যেন উক্ত নিয়্যতে মসজিদে আসে; এক খোদার ইবাদত করবে এবং ভাল ও মঙ্গল করতে শিখতে আসবে এবং ভাল করবে, সর্বত্র মঙ্গলের বিস্তার ঘটাবে। আমাদের নিয়্যত হবে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা যেন আমরা এমন লোকদের অর্ন্তভূক্ত হতে পারি যারা জেহাদের ছওয়াবের অধিকারী হয়েছেন। ছোট্ট ছোট্ট কথা, ছোট্ট ছোট্ট অসন্তোষ সৃষ্টিকারী কথা, মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করার মত বিষয় যেন না হয়। আমাদের মসজিদে যারা আসে তারা যেন আমাদের পরিবেশকে মঙ্গল ও কল্যাণময় করে তোলে-কষ্ট ও দুঃখদায়ক না হয়।

অতএব, যারা এ নিয়্যতে চেষ্টা করবে, তাদের এ চেষ্টা অবশ্যই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এতে করে একদিকে যেমন আপনারা আল্লাহ্র রহমতের ভাগীদার হবেন অপর দিকে আমাদের পরিবেশে সর্বত্র ভালবাসা ছড়াতে থাকবে। আহমদী জামাতের মসজিদ অবশ্যই মঙ্গল ও কল্যাণ বিতরণের কেন্দ্র হবে। সুতরাং এখানে যারা আসবেন তারা প্রত্যেকে যেন এমন নিয়্যত করে আসেন। যদি কেউ ফেৎনা ফাসাদের নিয়্যত করে আসে তাহলে সে সফলকাম হবে না। প্রত্যেক আহমদীর উচিৎ পরিবেশের উপর দৃষ্টি রাখা, যাচাই করতে থাকা যেন কোন অমঙ্গল জামাতের মাঝে বা মসজিদে সফলতা লাভ না করে। প্রত্যেক আহমদীর উচিৎ ইসলামের কল্যাণজনক শিক্ষাকে যেন সামনে রাখে। কারণ এটাই সেই জিনিস যা দ্বারা সঠিক ইসলামকে পৃথিবীতে প্রসারতা দেয়া যাবে। পথভ্রান্তকে পথ প্রদর্শন করতে হবে। আমাদের মসজিদগুলো শান্তির নিদর্শন, শান্তির প্রতীক, আল্লাহ্র সৃষ্ট মানব জাতিকে আল্লাহ্র কাছে নিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"আজ আমাদের জামাতের জন্য মসজিদের বড় প্রয়োজন। এটা আল্লাহ্র গৃহ হয়ে থাকে। যে গ্রামে বা শহরে আমাদের মসজিদ নির্মিত হয়ে যাবে। জেনে রেখ যে, সেখানে জামাতের উন্নতির ভিত্তি স্থাপন হয়ে গেছে। কোন স্থানে যদি মুসলমান কম থাকে বা না থাকে সেখানে যদি ইসলামের উন্নতি চাও, তাহলে সেখানে একটি মসজিদ বানিয়ে দেয়া উচিৎ। তখন খোদাতাআলা নিজেই মুসলমানদের টেনে নিয়ে আসবেন। কিন্তু শর্ত একটাই- মসজিদ নির্মাণের নিয়্যত যেন পবিত্র হয়। কেবল মাত্র আল্লাহ্র জন্য (মসজিদ) করতে হবে। ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য অথবা কোন মন্দ বা অনিষ্ট যেন নিয়্যতের মধ্যে প্রবেশ না করে। তবে আল্লাহ্ বরকত নাযেল করবেন। [মলফূযাত ; ৪র্থ খন্ড; পৃ: ৯৩]

জামাতের উন্নতি তখনই হবে যখন পৃথিবীকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হবে যে, আমাদের মসজিদ মানুষকে আল্লাহ্র সামনে মাথানত করানোর জন্য, ফেৎনা- ফ্যাসাদের জন্য নয়।

জামাতের উন্নতি তখনই হবে যখন পৃথিবীকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হবে যে, আমাদের মসজিদ মানুষকে আল্লাহ্র সামনে মাথানত করানোর জন্য, ফেৎনা- ফ্যাসাদের জন্য নয়। আল্লাহ্ করুন, এখানে যে মসজিদ আপনারা নির্মাণ করতে যাচ্ছেন- এ মসজিদ যেন এর সঠিক উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে পারে। আপনারা আপনাদের কর্তব্য বুঝতে ও পালন করতে পারেন। এ মসজিদ যেন এ অঞ্চলে জামাতের উন্নতির কারণ হয়। মানুষ যেন এর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

'মসজিদের প্রকৃত সৌন্দর্য এর দালানের সাথে হয় না; বরং নামাযীরা এর আসল সৌন্দর্যের কারণ হয় যারা বড় আন্তরিকতার সাথে এতে নামায আদায় করে। নতুবা এ সমস্ত মসজিদ জনশূণ্য পড়ে আছে। আঁ-হযরত (সঃ) এর মসজিদ ছোট্ট একটি মসজিদ ছিল। খেজুর পাতা দিয়ে বানানো হয়েছিল। বৃষ্টির সময় ছাদের পানি মসজিদের ভেতরে পড়ত। মসজিদের উজ্জলতা এর নামাযীদের দ্বারা হয়ে থাকে। আঁ-হযরত (সঃ) এর সময় সেখানে ইহজগতের প্রতি আশক্ত লোকেরাও একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল। আল্লাহ্র নির্দেশে সে মসজিদকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। ঐ মসজিদের নাম "মসজিদে যিরার" ছিল (অনিষ্ট সৃষ্টিকারী),ঐ মসজিদকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। মসজিদের জন্য নির্দেশ এই যে, মসজিদ যেন তাকওয়া ভিত্তিক হয়' (মলফূযাত ; ৪র্থ খন্ড; ৪৯১ পৃ:)।

আল্লাহ্ করুণ আমাদের মসজিদের ভিত্তি যেন তাকওয়ার উপর কায়েম হয়। আমরা যেন নিজেদের দুর্বলতাকে দূর করতে করতে, আল্লাহ্র সামনে এস্তেগফার করতে করতে, আল্লাহ্র সাহায্য চেয়ে চেয়ে এ মসজিদ নির্মাণ করি, আল্লাহ্ ভয়, আল্লাহ্র ভীতি যেন আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত থাকে, আমরা যেন কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করি যে, এবং পৃথিবীতে এর শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর না এবং ভয় ও আশা রেখে তাঁকে (আল্লাহ্কে) ডাক, আল্লাহ্র রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী (সূরা আরাফ : ৫৮)।

অতএব, আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে রেখে তাঁকে ডাকতে থাকব এবং আমাদের যদি কোন লোভ বা আকাঙ্খা থাকে তাহলে তা যেন কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করাই হয়। তিনি আমাদেরকে ঐ সমস্ত নেয়ামত দান করুন যার উল্লেখ তিনি কুরআনে নবীগণের সাথে করেছেন এবং আঁ-হযরত (সঃ) তাঁর উম্মতের জন্য যে সমস্ত দোয়া করেছেন তা আমরা যেন লাভ করি। ঐ সমস্ত পুণ্যকর্ম যেন আমরা করতে থাকি যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের কাছে চেয়েছেন, আল্লাহ্‌র রহমতের চাদর যেন চিরকাল আমাদেরকে জড়িয়ে রাখে। কখনই যেন আমাদেরকে ঐ ফ্যাসাদকারীদের দলে গণ্য করা না হয়। যার উল্লেখ শুরুতে করা হয়েছে। যারা সংশোধনের পরে পুনরায় বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। বরং চিরকাল আমাদের প্রত্যেক কাজ যেন আল্লাহ্‌র ভালবাসাকে জড় করতে থাকে। আল্লাহ্ করুণ আমরা যেন হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর এই দোয়াকে আমাদের জীবনের অংশ বানাতে পারি যে, " হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই-, আমি যেন কখনই কারো প্রতি যুলুম, অত্যাচার না করি। আমার উপরও যেন অত্যাচার, করা না হয়।" অনেক ছোট ছোট কথা হয়ে থাকে। যেখানে শয়তান মানুষকে তার মিথ্যা আমিত্বের জালে জড়িয়ে দেয়-; তখন সে ভাল করে না দেখে, না জেনে কুধারণার উপর ভিত্তি করে একে অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে, অকথ্য ভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করে বসে। প্রত্যেক আহমদীর চিন্তা করে দেখা উচিৎ যে, সে এ যুগের ইমামকে মান্য করে প্রতিজ্ঞা করেছে; এমনতো নয় যে, সে ঐসব কাজ করে; ধৈর্য ধারণ না করে, কুধারণা বশতঃ একজনকে তুচ্ছজ্ঞান করে, অহংকার প্রদর্শন করে ঐ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী হচ্ছে? অতএব, আপনারা এখন চিন্তা করে যাচাই করবেন, প্রত্যেকে নিজের বিষয়টি যাচাই করবেন, তাহলে একদিকে আপনি আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী বান্দা হবেন, অপরদিকে সেখানের পরিবেশকে ভালবাসার সুবাসে ভরে তুলবেন। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের সকলকে এমন করার শক্তিদান করুণ।

আমার সাথে যদি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত কর- তাহলে আমার আগমনের উদ্দেশ্যকে সফল করতে হবে। আর সেটা এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্থতা দেখাও, কুরআনের শিক্ষাগুলোর উপর আমল কর। যেমন আঁ হযরত (সঃ) করে দেখিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) করে দেখিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (সঃ) বলেছেন ঃ

"স্মরণ রেখ, আমাদের জামাত এমন নয় যেমন অন্যান্য সংসার প্রেমিকরা জীবন যাপন করে। শুধু শুধু মুখে বলে দেয়া যে, আমরা এ জামাতের সদস্য তারপর কাজে কর্মে কিছুই নাই- যেমন দুঃখজনকভাবে মুসলমানের অবস্থা-, যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনারা কি মুসলমান? উত্তর শুকুর আল হামদুলিল্লাহ! কিন্তু নামায পড়ে না, অন্য কোন ইসলামের নিদর্শনকেও সম্মান প্রদর্শন করে না। সুতরাং আমি তোমাদের কাছে চাই না যে, তোমরা কেবল মুখে বল এবং কাজে কর্মে কিছু না করে দেখাও। এটা তো কর্মহীন দশা। আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে এর সংশোধনের জন্য দাঁড় করিয়েছেন। অতএব, এখন আমার সাথে সম্পর্ক রেখেও যদি কেউ নিজের অবস্থার উন্নতি না করে, কর্ম ক্ষমতাগুলোকে কার্যকর না করে, কেবল মৌখিকভাবে জামাতে শামীল বলে বক্তব্য দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করে, সে এমনই যেমন নিজ কর্ম দ্বারা আমার অপ্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করে। এখন তোমরা যদি নিজেদের কর্ম দ্বারা প্রমাণ কর যে, আমর আগমন অনর্থক তাহলে আমার সাথে সম্পর্ক রাখার অর্থ কি? আমার সাথে যদি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত কর-তাহলে আমার আগমনের উদ্দেশ্যকে সফল করতে হবে। আর সেটা এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্থতা দেখাও, কুরআনের শিক্ষাগুলোর উপর আমল কর। যেমন আঁ হযরত (সঃ) করে দেখিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) করে দেখিয়েছেন। কুরআন শরীফের আসল উদ্দেশ্য কি তা জানতে চেষ্টা কর এবং সেই মত কার্যক্রম কর। আল্লাহ্‌র কাছে এটা যথেষ্ট নয় যে, কেবল মৌখিক স্বীকার করার পর কাজে কর্মে তার কোন প্রতিফল নাই। স্মরণ রেখ, আল্লাহ্‌তাআলা যে জামাত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তা কর্মকান্ড ব্যতীত জীবিত থাকতে পারে না। [অর্থাৎ সৎকর্ম ছাড়া চলতে পারেনা]। এটি সেই মহান জাতি যার জন্য হযরত আদম (আঃ) এর সময় থেকে কাজ আরম্ভ হয়েছে। কোন নবী আসেন নি যিনি এর জন্য আহ্বান না জানিয়েছেন। অতএব, তোমরা এর মূল্যায়ন কর, এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। এর সঠিক মূল্যায়ন এই যে, নিজ কার্যক্রম দ্বারা প্রমাণ কর যে, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দল-ই তোমরা।"

(মলফূযাত, ২য় খন্ড, ২৮২ পৃঃ)

অতএব, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যে স্থানে জামাতকে দেখতে চেয়েছেন তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। তারপর হযরত (আঃ) জামাতকে সতর্ক করে একবার বলেছেনঃ

"আমার জামাতের সকলে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছো আমার এই তাকিদপূর্ণ উপদেশ গুরুত্বের সাথে শোন যে, যারা আমার এ সিলসিলার মধ্যে প্রবেশ করে আমার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার সম্পর্ক এবং আমার মুরিদ (অনুসারী) হতে চায় এই উদ্দেশ্যে যে, তারা ন্যায়-পরায়ন হবে, সৌভাগ্যবান হবে, তাকওয়ার উচ্চস্তরে উন্নীত হবে, কোন প্রকার ফ্যাসাদ (বিশৃঙ্খলা) বা দুষ্টামী বা মন্দ আচরণের কাছেও যাবে না। তারা পাঁচ-ওয়াক্ত নামায বাজামাত আদায় করতে বদ্ধ পরিকর হয়ে থাকবে। তারা মিথ্যা বলবে না, কাউকে মন্দ বা কটু কথা বলে কষ্ট দিবে না। তারা কোন প্রকার কু-কর্মে লিপ্ত হবে না। কোন প্রকার দুষ্টামী, যুলুম-অত্যাচার, ফেৎনা-ফ্যাসাদের চিন্তাও তাদের মনে আসবে না"। (এখানে হযরত (আঃ) যুলুম করবে না বলেন নি- বলেছেন যুলুমের কথা চিন্তাও করবে না) "মোট কথা, প্রত্যেক প্রকার পাপ-গুনাহ, বা অপরাধ এবং তা করতে হয় না, তা বলতে হয় না (তা করবে না এবং বলবে না) এবং সকল প্রকার আবেগ ও উত্তেজনা এবং অন্যায় আচরণ করা থেকে বিরত থাকবে। পবিত্র মন, অনিষ্ট-অনাচার বিবর্জিত এবং সাদাসিদে মনের অধিকারী আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে যাও যেন কোন প্রকার বিষাক্ত উপাদান দেহ-মনে কোথাও না থাকে। তাদের নীতি হবে সকল মানুষের জন্য সমবেদনা এবং এবং আল্লাহ্‌র ভয়। নিজ-জিহ্বা, হাত এবং অন্তরকে প্রত্যেক প্রকার অপবিত্র চিন্তা এবং ফেৎনা সৃষ্টির পদ্ধতি এবং অন্যের ক্ষতির চিন্তা থেকে বিরত রাখবে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ যত্নবান

থাকবে।" এ দিকটায় জামাতের অনেক দুর্বলতা আছে। অর্থাৎ নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হয় না। তারপর "অত্যাচার-অবিচারে সীমালঙ্ঘন করা, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ; ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ, অন্যের প্রাপ্যধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা, মানুষের অধিকার তাদের না দেয়া এবং অন্যায়ভাবে কারো পক্ষপাতিত্ব করা থেকে বিরত থাকবে।"

অন্যায়ভাবে কারে পক্ষপাতিত্বের মধ্যে এটাও হতে পারে যে, আত্মীয়দের বিষয় যখন বিচার বা সিদ্ধান্তের জন্য আসে তখন বিনা কারণে আত্মীয়ের পক্ষে কথা বলা। জামাতের কাছে যখন কোন অভিযোগ আসে তখন অন্যায়ভাবে নিজের লোকেদের পক্ষে চেষ্টা করা হয়। অথবা নিজ আত্মীয়ের পক্ষে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এসব বিষয়গুলো এমন যে, জামাতের প্রত্যেক আহমদীরই উচিৎ এর থেকে বিরত থাকা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

"এবং কোন অসৎসঙ্গ অবলম্বন করবে না। পরবর্তীতে যদি প্রামাণ পাওয়া যায় যে, এক ব্যক্তি যে তাদের সাথে যাতায়াত ও যোগাযোগ রাখে সে আল্লাহ্‌র আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে না, মানবাধিকাররের কোন পরোয়া করে না অথবা সে জালেম স্বভাবের এবং দুষ্ট মেজাজের অথবা তার চাল চলন ভাল না। অথবা যার সাথে তোমাদের বয়আত এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার সম্পর্ক (অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং পরবর্তীতে তার খলীফাগণের সম্পর্কে) তার সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি অন্যায় এবং অকারণে মন্দ কথা বলে, গালমন্দ করে থাকে, মন্দ কথা ও অন্যায় অপবাদ আরোপ করে থাকে এবং এভাবে আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতারণা করতে চায়- তাহলে তোমাদের উচিৎ এমন অসৎ জিনিসকে নিজেদের মাঝখান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। এমন ব্যক্তির থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখ যে, ভয়ংকর। এবং **তোমরা কখনও কোন ধর্মের, কোন জাতির, কোন দলের, কোন লোকে ক্ষতির করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে না। বরং প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রকৃতপক্ষে মঙ্গল কামনা কর। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে এমন হয়ে যাও, সকলকে ভাল উপদেশ দাও, ভাল পরামর্শ দাও, তার মঙ্গল চাও।** এমন হওয়া উচিৎ যে, দুষ্ট, অসৎ চরিত্রের লোক ফাসাদী ব্যক্তি, যার চালচলন অসৎ, সে যেন কোন অবস্থাতেই তোমাদের মজলিসে বসতে না পারে। তোমাদের গৃহে যেন এমন লোক অবস্থান না করে যে যেকোন মুহূর্তে তোমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। এসব বিষয়গুলো, এসব শর্তগুলো এমন যে, আমি শুরু থেকে বলে আসছি। আমার জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই এ সমস্ত জরুরী নির্দেশ পালন করে চলবে। তোমাদের মজলিসে কখনই যেন তোমরা কোন অপবিত্র কথা এবং হাসি-মজাক নিয়ে মাতিয়ে থাকবে না এবং তোমরা সর্বক্ষেত্রে পবিত্র মন, পবিত্র মনোভাব, পবিত্র চিন্তাভাবনা নিয়ে জীবন যাপন করবে।" কোন কোন মানুষের অভ্যাস থাকে-মজলিসে বসে আসর জমাতে গিয়ে অন্যের প্রতি হাসি ঠাট্টা করতে আরম্ভ করে দেয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

"স্মরণ রেখ, প্রত্যেক মন্দ প্রতিবাদ করার মত হয় না। অতএব তোমাদের উচিৎ তোমরা বেশির ভাগ সময় মন্দ দেখে দৃষ্টি সরিয়ে নাও-দেখ না, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস কর। ধৈর্য, নম্রতা প্রদর্শন কর, কারো প্রতি অন্যায় আক্রমণ করবে না। নিজের জোশ , আবেগ ও উত্তেজনাকে চেপে দাও।"

তারপর হযরত আকদাস (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

"খোদাতাআলা তোমাদেরকে এমন একটি জামাত বানাতে চান যে, তোমরা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য পুণ্য ও ন্যায়পরায়ণতার নমুনা হও।" এখন নমুনা তো তখন হবেন যখন আপনরা নিজেদের মধ্যে এমন সব পরিবর্তন সাধন করবেন যে একটি মান সম্মত জাতি বলে দৃশ্যমান হবেন। যাদের দেখে অন্যরা যেন বলতে পারে যে, হ্যাঁ, সত্যিই এমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা অনুকরণযোগ্য নমুনা হয়েছে।

তারপর হযরত (আঃ) বলেছেন: "অতএব, নিজেদের মধ্য হতে এমন লোকদের শিঘ্র বের করে দাও যারা, দুষ্টামী, ফেৎনা সৃষ্টিকারী এবং পাপিষ্ট ব্যক্তির নমুনা। যারা আমাদের জামাতের মধ্যে সাদাসিধে, পুণ্যবান, ন্যায়পরায়ণ, নম্র স্বভাব, মৃদুভাষী, সৎ স্বভাব ও নেক-চাল-চলন সহকারে থাকতে পারবে না তারা যেন শিঘ্রই পৃথক হয়ে যায়। কারণ আমাদের খোদা চান না যে, এমন ব্যক্তি আমাদের সাথে থাকুক। নিশ্চয় সে হতভাগ্য হয়ে মরবে। কারণ সে পুণ্যের পথ অবলম্বন করেনি। সুতরাং তোমরা সাবধান! প্রকৃত অর্থে পুণ্যবান হয়ে যাও, নম্র মেজাজ ও ন্যায়পরায়ণ হয়ে যাও। তোমরা তোমাদের পাঁচ-ওয়াক্তের নামায ও চারিত্রিক গুণাবলী দিয়ে চিহ্নিত হবে। যার মধ্যে পাপের বীজ রয়েছে সে এ উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। (তবলীগে বেসালত; ৭ম খন্ড; ৪২-৪৫ পৃ:)।

তোমরা সাবধান! প্রকৃত অর্থে পুণ্যবান হয়ে যাও, নম্র মেজাজ ও ন্যায়পরায়ণ হয়ে যাও। তোমরা তোমাদের পাঁচ-ওয়াক্তের নামায ও চারিত্রিক গুণাবলী দিয়ে চিহ্নিত হবে। যার মধ্যে পাপের বীজ রয়েছে সে এ উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে ঐ মানদন্ডের উপর পৌঁছার শক্তিদান করুন যার উপর হুযূর (আঃ) আমাদেরকে আনতে চান। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের শক্তি দান করুন যেন আমরা হুযূর (আঃ) এর উদ্দ্যেকে সফল করে সারা পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা উড়াতে পারি। আমাদের কোন কর্ম যেন এমন না হয় যা হুযূর (আঃ) পছন্দ করেন নি। আমাদের সমস্ত কাজ কর্ম যেন এমন হয় যে, আমরা হুযূর (আঃ) দোয়ার কল্যাণ লাভ করতে পারি।

(আল ফযল লন্ডন, ২৪ জুন, ২০০৫ইং)

অনুবাদ ঃ **মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
মুরব্বী সিলসিলাহ

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ?

হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)

আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ আবার কি? ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক তো ঠিক তেমনি ঘনিষ্ঠ, যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আলোর সঙ্গে অন্ধকারের অথবা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর অথবা শান্তির সঙ্গে যুদ্ধের। তারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয় বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে। তাদেরকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তারা তো কখনই খুশী মনে হাত ধরাধরি করে একত্রে চলে না।

তবু, এটাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, অনেক ঘটনায় কিছু কিছু মুসলমানকে দেখা যায় যে, তারা সন্ত্রাসী ক্রিয়াকান্ডে জড়িত হয়ে পড়েছে; এবং তারা এটা করে থাকে হয় কোন গোষ্ঠীর পক্ষে , নয়তো মুসলিম-প্রধান কোন দেশের পক্ষে।

সারা দুনিয়াতে কি অন্যান্য আরও অনেক দল অনুরূপ সন্ত্রাসী ও অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকান্ডে জড়িত নেই ? 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ' কথাটির জন্ম দেওয়া হয়েছে যে নীতি অনুসারে, সেই একই নীতির অনুসরণে কি অন্যান্য সব ব্রান্ডের সন্ত্রাসীদলকেও একই ধরনের নাম দেওয়া ঠিক হবে? এবং এই করে শিখ সন্ত্রাসবাদ, হিন্দু সন্ত্রাসবাদ, খৃষ্টান সন্ত্রাসবাদ, ইহুদী সন্ত্রাসবাদ, নাস্তিক সন্ত্রাসবাদ, বৌদ্ধ সন্ত্রাসবাদ, সর্বপ্রাণবাদী সন্ত্রাসবাদ, প্রকৃতি পূজক সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতির একটা তালিক প্রস্তুত করা কি ঠিক হবে?

দুর্ভাগ্যক্রমে, আজ সারাটা পৃথিবী জুড়েই বিভিন্ন ব্রান্ডের যে সমস্ত সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রতি চোখ বন্ধ করে বসে থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বস্তুতঃপক্ষে, কোন বিশেষ আর্দশ বা কোন মহৎ উদ্দেশ্যের নামে যে সব নির্যাতন, রক্তপাত ও খুন-খারাপী চালানো হচ্ছে তার প্রতি সতর্ক হয়ে না ওঠা যে কোন দর্শকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সন্ত্রাসবাদ একটা বিশ্বজোড়া সমস্যা। সুতরাং এ সম্পর্কে আলোচনাও হওয়া উচিত ব্যাপকতর পরিসরে। হিংস্রতার পশ্চাতে যে শক্তি নিহিত, তা না বুঝা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবো না যে, কেন কিছু কিছু গ্রুপ এবং রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেছে।

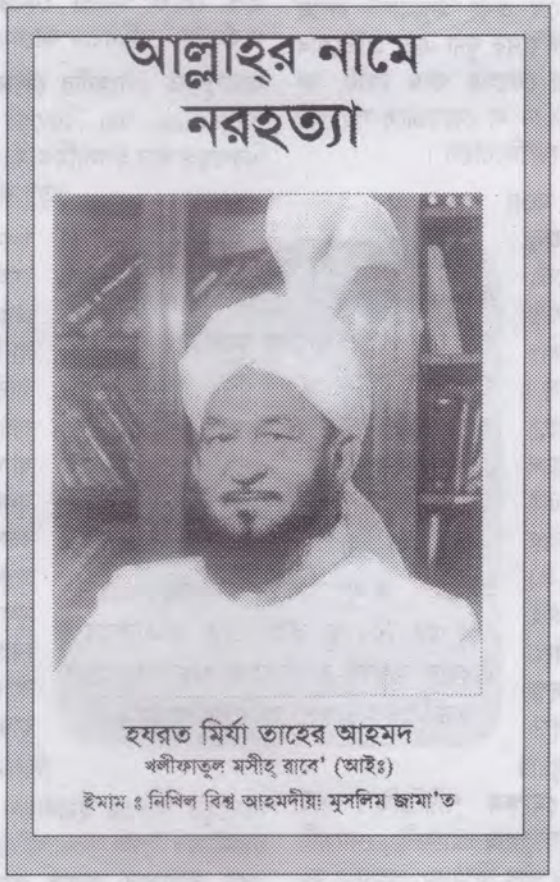

আমি এ ব্যাপারে সন্দেহাতীতরূপে নিশ্চিত যে, প্রায় প্রত্যেক ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ-হাঙ্গামা, যা আজকের পৃথিবীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা যে আকারেই হোক, আর যে লেবাসেই হোক, তার প্রকৃতি মূলতঃ রাজনৈতিক। ধর্ম এখানে ব্যবহারকারী নয়, স্বয়ং ধর্মকেই ব্যবহার করা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা দেখি যে, সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি হচ্ছে গোত্রীয় কারণে; কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রকৃতিগতভাবে এর মূল কারণ রাজনৈতিক। অন্যান্য অনেক অনেক ছোট ছোট কারণেও সন্ত্রাসবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এবং তা ঘটে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতির বিরুদ্ধে দ্রোহজনিত কারণে। এগুলোকে মনে করা হয়, সাধারণতঃ, খেপাদের এবং নৈরাজ্যবাদীদের কান্ড। এক প্রকার বিশেষ ধরনেরও সন্ত্রাসবাদ আছে যা 'মাফিয়া'দের (Mofia) প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সন্ত্রাসবাদ সংঘটিত হয় মাফিয়ার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দল উপদলের মধ্যে। এবং স্পষ্টতঃই, এই সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে আসলে ক্ষমতার লড়াই; অতএব, রাজনৈতিক।

আমরা যখন তথাকথিত 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের' প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে রাজনৈতিক শক্তিই সক্রিয় রয়েছে কোন ইসলামিক বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর পিছনে। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পিছন থেকে কল-কাঠি নাড়ছে যারা এদেরকে ব্যবহার করছে, তার আসলে কেউ মুসলমানই নয়।

চলুন, আমরা এবারে, সন্ত্রাসবাদের বিশেষ কোন ঘটনা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, যাতে আমরা এর ভেতরে উপসর্গগুলো দেখে এর প্রকৃত রোগ নির্ণয় করতে পারি। আমরা ইরানকে দিয়েই শুরু করবো, এবং আমরা দেখবো, কী করে খোমেনিজমের (**Kohmeinism**) জন্ম হলো।

একথা সবাই জানে যে, শাহ্- এর আমলে প্রাচুর্য যথেষ্টই ছিল। অতি উচ্চাভিলাষী শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানা পরিকল্পনা দেশটির ভবিষ্যৎ সম্ভবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। কিন্তু, মানুষ কি শুধু রুটিতে বাঁচতে পারে? এর উত্তরে, শাহ্-এর স্বৈরাচারী শাসনামলের ইরানীদের বেলায় যতটা বলা যায়, তা হচ্ছে একটা জোরালো 'না'। তারা দেশের শাসনকার্য পরিচালনায় একটা দায়িত্বশীল অংশ পেতে চেয়েছিল। তারা শুধু পেট ভরে খেতে পাওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারছিল না। তাদের

আত্ম-সম্মান ও মর্যাদা লাভের আকাংখা তাদের একটা অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও নির্যাতন-মূলক শাসন ব্যবস্থার কবল থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের ব্যাকুলতা তাদেরকে দারুণ অবাধ্য ও অস্থির করে তুলেছিল। এবং এই পরিস্থিতিটা প্রচন্ড একটা রক্তাক্ত বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল সম্পূর্ণরূপেই।

প্রকৃতিগতভাবে এই অনিবার্য বিপ্লব যদি মুলতঃ, ইসলামী চরিত্রের না হতো, তাহলে এটা হতো একটা কম্যুনিষ্ট বিপ্লব, এবং তা আরও বেশি রক্তাক্ত, এবং আরও বেশি মারাত্মক হতে পারতো। এই ভূমিকম্প (আন্দোলন), যা ইরানকে উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রকম্পিত করে তুলেছিল, ওলট-পালট করে দিয়েছিল, তা ছিল বহুদিনের রাজনৈতিক নির্যাতন, মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন, বিবেকের স্বাধীনতা হরণ এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের একটি বৃহৎ শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ইরান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল যে, শাহ্-এর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে পিছন থেকে পূরোপুরিভাবে সাহায্য করছে, সমর্থন দিচ্ছে এবং অনুমোদন দিচ্ছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার। কাজেই, জনগণের ঘৃণা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা শাহ্-এর শাসনকে উল্টিয়ে ফেলেই ক্ষান্ত হয়নি, তা রাজতন্ত্রকে রক্ষার স্বার্থে যে সমস্ত শক্তি কোন না কোনভাবে সহায়তা করেছিল, সেগুলির প্রত্যেকটিকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল।

আমেরিকান সমর্থনের সচেতনতা শাহ্- এর মধ্যে নিকৃষ্ট সার্বভৌম স্বৈরতান্ত্রিক প্রকৃতির জন্ম দিয়েছিল। প্রথমদিকে তাকে ভয় করা হতো, কিন্তু পরে ক্রমান্বয়ে সেই ভয় সন্ত্রাসে রূপান্তরিত হয়। সময়ের ব্যবধানে বিদ্রোহের ভয় তাঁর মনোভাবকে আরও বেশি কঠোর করে তুলে। ক্রমে ক্রমে একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হয় ইরান। সময় গড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ইরানীরা এটা বুঝতে পারে যে, এই পুলিশী রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র (ইউ.এস.এ) সরকার। শাহ্ মাত্র একটা পুতুলের ভূমিকাই পালন করছেন, এবং তার সুতোগুলো বাঁধা আছে যুক্তরাষ্ট্রের সূক্ষ্ম সুচতুর ও দক্ষ আংগুলগুলোতে। এটাই, যেমনটা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সৃষ্টি করেছিল সেই ঘৃণার সর্বগ্রাসী আগুন জ্বালানো বিপ্লবের মোক্ষম পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিটাকে পুঁজি রূপে কাজে লাগান আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী। খোমেনী যে মতাদর্শ পেশ করেন এবং যা দ্বারা তিনি তাঁর বিপ্লবের চেহারায় রঙ লাগান, তা হচ্ছে শিয়া ইসলাম। কিন্তু, সত্যিই কি শিয়া ইসলামের প্রতি যে ভালবাসা, তা-ই ইউ.এস.এ.-এর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করেছিল, না কি ইসলামের নামকে সামনে রেখে তার আড়ালে আসল উদ্দেশ্যকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল? খোমেনী যদি ইসলামের পতাকা না উড়াতেন, তাহলে কি অন্য আর কোন নামে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারতো? এটা কি সত্য নয় যে, খোমেনী যদি পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ না করতেন এবং এটাকে একটা ইসলামী রঙ ও রূপ না দিতেন, তাহলে কি একই ঘৃণার পরিস্থিতিকে সমভাবেই ব্যবহার করতে পারতো না কোন অ-ধর্মীয় (নন্ রিলিজিয়াস) দর্শন যেমন, জাতীয়তাবাদ কিংবা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ?

বস্তুতঃ, খোমেনী যাবতীয় সেই শক্তিকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন, যে শক্তিগুলো তাঁরই অনুসরণে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, এবং যারা সময় পেলে তাঁকে এবং লক্ষ্যকেও অতিক্রম করে এগিয়ে যেত। এ কারণেই, ইরানের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও ঘোলাটে হয়ে ওঠেছিল। বিপ্লবের প্রেরণা কম্যুনিজম বা কোন বামপন্থী দর্শনের বিরুদ্ধে ছিল না; বরং তা ছিল শাহ্ এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে। যেহেতু, বিপ্লবের গতিধারা খোমেনীর হাত থেকে বামপন্থী নেতৃত্বের হাতে চলে যাওয়ার একটা প্রকৃত সম্ভাবনা ছিল, সেহেতু খোমেনীকে একই সঙ্গে, তিনটি ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়েছিল। শাহ্কে সিংহাসনচ্যুত করার পর, তিনি শুধু ভূতপূর্ব শাহের সমস্ত সমর্থককেই উৎখাত ও ধ্বংস করে দেননি, আমেরিকার প্রভাবকেও উপরে ফেলেছিলেন, এবং এ ব্যাপারে কোথাও কোন সন্দেহের লেশ রাখেন নি। কেননা, এ স্বয়ং বামপন্থী মতাদর্শকেই সমর্থন দিতো এবং তাকে অপ্রতিহতভাবে বাড়তে দিলে, তা খোমেনীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইসলামিক মতাদর্শের পরিবর্তে মার্কস্বাদ-লেনিনবাদ কায়েম করতো।

আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর সৌভাগ্য যে, তিনি শুধু আমেরিকান ডানবাদ (Rightism)- এর বিরুদ্ধেই নয়, রাশিয়ার বামবাদ (Leftism)- এর বিরুদ্ধেও তাঁর ইসলামিক মতাদর্শের দু'ধারি তরবারি চালাবার মত যথেষ্ট চতুর শক্তিশালী ছিলেন।

একটা আর যা-ই থাক এটা ইসলাম ছিল না, যা কিনা ইরানী বিপ্লবকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং পরিচালিত করেছিল। খুব বেশি হলে আপনি যদি একটা কিছু বলতেই চান, তাহলে ইরানে যা ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে, সেটাকে আপনি বলতে পারেন খোমেনিজম (খোমেনীবাদ)। আসল যে শক্তিগুলো কাজ করছে, সেগুলোর প্রকৃতি না সত্যিকারভাবে ইসলামী, না মূলগতভাবে ইসলামী। বস্তুতঃ, শাহ্-এর বিরুদ্ধে ইরানীদের প্রতিক্রিয়াকে ব্যবহার করেছে রাজনৈতিক শক্তিগুলো স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে।

যখন সব কথা বলা হলো এবং সব কাজ হয়ে গেল, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে, একটা আর যা-ই থাক এটা ইসলাম ছিল না, যা কিনা ইরানী বিপ্লবকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং পরিচালিত করেছিল। খুব বেশি হলে আপনি যদি একটা কিছু বলতেই চান, তাহলে ইরানে যা ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে, সেটাকে আপনি বলতে পারেন খোমেনিজম (খোমেনীবাদ)। আসল যে শক্তিগুলো কাজ করছে, সেগুলোর প্রকৃতি না সত্যিকারভাবে ইসলামী, না মূলগতভাবে ইসলামী। বস্তুতঃ, শাহ্-এর বিরুদ্ধে ইরানীদের প্রতিক্রিয়াকে ব্যবহার করেছে রাজনৈতিক শক্তিগুলো স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে।

বিদেশী বিভিন্ন প্রকার শক্তির অধীনে শোষণের ও দাসত্বের বিরুদ্ধে ইরানীয়ান সচেতনতার এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ইরানীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এই সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, ইরানীরা তাদের মাতৃভূমি আরবদের দ্বারা বিজিত হওয়ার ঘটনাকে কখনই ভুলতে পারেনি; ক্ষমা করতে পারেনি। যদিও, ক্ষতস্থানগুলো বহু পূর্বেই সেরে ওঠেছে বলেই মনে হয়, এবং যদিও অনেক শক্তি সম্পন্ন উপাদান যেমন, ধর্মীয়ভাবে অভিন্ন জনসাধারণ, অপরাপর দেশের প্রতি অভিন্ন শত্রুতা, আরব ও ইরানীদেরকে একত্র রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তবু এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ইরানীদের উপরে আরবদের কয়েক শতাব্দীর শাসনের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ তা এখনও ভেতরে ভেতরে বিরাজমান রয়েছে। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রাক-ইসলামী

যুগে ইরান এমন একটি শক্তিশালী ও বৈচিত্রময় সভ্যতার অধিকারী ছিল, যার জন্যে সে গর্ব করতে পারতো, ইসলামের সূচনাকালে আরবরা মাত্র দু'টো বিশ্বের খবর রাখতো-একটি পাশ্চাত্যেঃ রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বিশ্ব; অপরটি প্রাচ্যে' ইরানের খসরুদের দ্বারা শাসিত বিশ্ব। দূর অতীতের গৌরবময় সেই স্মৃতি যদিও ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের শক্তিশালী প্রভাবের দ্বারা অনেকাংশে চাপা পড়ে গেছে, তবু তা সম্পূর্ণরূপে মুছে যায় নি। সেই মহান ইরানী সভ্যতা ইরানী বুদ্ধিজীবীদের হৃদয়ে সুদীর্ঘকাল ধরেই ছায়াপাত করে চলেছে।

আরব-ইরানী বিবাদের দীর্ঘ ইতিহাস এবং আরবের ভিতরে ইরানীদের শাস্তিমূলক অভিযানসমূহ আরবদের মনেও যে বিশ্রী ও বিরক্তিকর ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে তা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নিরাময়কারী সময়ও মুছে ফেলতে পারে নি। এবং এটাই মানুষের জন্যে স্বাভাবিক। সারা পৃথিবীতেই দেখা যায়, মানুষের পক্ষে অনেকসময় অতীত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং তাদের সম্মানের প্রতি আঘাত ও অমর্যাদাকে ভুলে যাওয়াটা কঠিন হয়ে পড়ে। ইতিহাসের এই সব অধ্যায় কখনই চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় না, বরং তা বারবার উন্মোচিত হয়।

অতীতের আরব-ইরানী বিবাদের উল্লেখ তো যথেষ্টই করা হলো। এখন আমরা অতি আধুনিক সময়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাই। ইরানীরা যে কেবল আরবদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ ও ক্ষোভ পোষণ করতো, তা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, ইরানীদেরকে বৃহৎ বৃটিশ সেনাবাহিনীর অতি নিকৃষ্ট ধরনের শাসনের কবলে আনা হয়েছিল। পক্ষান্তরে, আরবদের বেলায়, অন্ততঃ, অভিন্ন কৃষ্টি ও ধর্মীয় বন্ধনের একটা ত্রাণকারী উপাদান ছিল। ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিতের মধ্যকার ব্যবধানটা কমে আসার পরিবর্তে বেড়েই চলছিল এবং এই ব্যবধানটা অনুরূপ কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা ধর্মীয় উপাদানের দ্বারা কমিয়ে ফেলাও সম্ভব ছিল না।

যে ঘৃণার আগুন পরিশেষে খোমেনিয়ান বিপ্লবের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল তা শুধু আমেরিকার উৎপীড়নের ফল নয়, তা বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছিল ঠিক ভূগর্ভস্থ তেল ও গ্যাসের খনির মতই। গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয়, তা হচ্ছে, এই ঘৃণা আসলে কোনভাবেই ধর্মীয় ছিল না। এই ঘৃণাকে খোমেনী যদি ইসলামের নামে ব্যবহার না করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু কম্যুনিষ্ট নেতা এটাকে ব্যবহার করতো সামাজিক সুবিচারের নামে। ধর্মীয়, অধর্মীয় যে নামেই এই বিপ্লবকে আখ্যায়িত করা হোক না কেন, এর অন্তর্নিহিত শক্তি ও উপাদান অভিন্ন।

বৃটিশ কর্তৃত্ব ও প্রভাবের পতনের পর, বড় বড় শক্তিগুলো কর্তৃক তাবেদার ও পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপরে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও দমনের যুগ সূচিত হয়। নব্য-সাম্রাজ্যবাদের এই সময়ে ইরানী আশ্রিত বালকটিকে বৃটিশের কোল থেকে আমেরিকার কোলে তুলে দেওয়া হয়। এ করেই ইরানের শাহ্ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতীকে পরিণত হয়। যে সাম্রাজ্যবাদ সমর্থন করেছিল পরস্পরবিরোধী নানান মতাদর্শকে নিজের স্বার্থেই, যেমনটা সে আজও করে চলেছে পোলান্ডে, নিকারাগুয়ায়, ইসরাঈলে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়।

যে ঘৃণার আগুন পরিশেষে খোমেনিয়ান বিপ্লবের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল তা শুধু আমেরিকার উৎপীড়নের ফল নয়, তা বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছিল ঠিক ভূগর্ভস্থ তেল ও গ্যাসের খনির মতই। গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয়, তা হচ্ছে, এই ঘৃণা আসলে কোনভাবেই ধর্মীয় ছিল না। এই ঘৃণাকে খোমেনী যদি ইসলামের নামে ব্যবহার না করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু কম্যুনিষ্ট নেতা এটাকে ব্যবহার করতো সামাজিক সুবিচারের নামে। ধর্মীয়, অধর্মীয় যে নামেই এই বিপ্লবকে আখ্যায়িত করা হোক না কেন, এর অন্তর্নিহিত শক্তি ও উপাদান অভিন্ন।

যারা মনে করে যে, খোমেনী তাঁর নিজের লোকদের অনেকের বিরুদ্ধে যে সব কঠোর বাড়াবড়ি করেছেন এবং অন্যান্য অনেক দেশের বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিশোধমূলক ক্রিয়াকান্ড চালিয়েছেন তা সবই ছিল ইসলামী চরিত্রের, তাদেরকে আমি বহুবার দেখিয়ে দিয়েছি যে, এই সমস্ত ইরানী অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে ধর্ম হিসেবে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। একভাবে একথাও বলা যায় যে, পাশ্চাত্যের উচিত আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীকে তাদের শত্রু না ভেবে, বরং পৃষ্ঠপোষকরূপেই গণ্য করা। আমি একথা এজন্যই বলছি যে, আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে খোমেনী যদি পরিস্থিতির সুযোগ না নিতেন এবং তাকে মুসলিম মোল্লাগোষ্ঠীর একটা জান্তার সমর্থনে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে যদি একটা ইসলামী চেহারা না দিতেন, তাহলে তা নিশ্চিতরূপেই বামপন্থী ইরানী নেতাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো। ফলে, যে ইরানকে আজ আমরা সবুজের উপরে লাল রং ছিটানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, তার সারাটাই লালে লাল দেখতে পেতাম। একথা বলাটা নিতান্ত হাস্যকর হবে যে, ডঃ মুসাদ্দেক যে কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব সংগঠিত করেছিলেন এবং ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তা শাহ-এর সিংহাসনচ্যুতির সময় এতই দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল যে, তা ইরানের ইতিহাসের এই যুগান্ত কারী পরিবর্তনের সময় কোন কার্যকর ও বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম ছিল না। বস্তুতঃ, কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বকে খুব ভালভাবেই সমর্থন দেওয়া হয়েছিল, এবং ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। এবং তা সুযোগ গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু, তারা তা পারেনি আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর জন্য। নইলে ইরানে একটা কট্টর মার্কসপন্থী শাসন কায়েম হয়ে যেতো। তেমনটা হলে, তা হতো মধ্য-প্রাচ্যের তেল-সমৃদ্ধ কিন্তু সামরিক দিক থেকে দুর্বল দেশগুলোর জন্য একটা সর্বনাশা ঘটনা। অতএব, খোমেনিয়ান ইসলাম, প্রতীচ্যের দৃষ্টিতে তা যতই শুষ্ক ও বিরক্তিকর প্রতীয়মান হোক না কেন, তা তাদের জন্য হয়েছিল শাপে বর। এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা উচিত আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর ভূমিকাকে। *(চলবে)*

(পুস্তক-আল্লাহ্‌র নামে নরহত্যা)

অনুবাদ-শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

আহমদীয়ত

মূল ঃ কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব ফাযেল

(৩য় কিস্তি)

'আমি মুসলমান। কুরআন করীমকে *খাতামুল কুতুব* আর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে *খাতামুল আম্বিয়া* মান্য করি। ইসলামকে একটি জীবন্ত ধর্ম এবং মুক্তির প্রকৃত মাধ্যম নির্ধারণ করে দিচ্ছি। খোদাতাআলার নিয়তি বা শক্তির মহিমা এবং কিয়ামতের দিনে বিশ্বাস রাখি। সেই কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ি। অনেক বেশি নামায পড়ি ও রমযানের পুরো রোযা রাখি' (মলফূযাত ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা:১০৭-১০৮)।

'মোরা তো মুসলমানের ধর্ম পালন করি।
অন্তর থেকে খাতামুল মুরসালীন (সঃ)-এর সেবক মোরা॥
শির্ক ও বিদাত-এর প্রতি বিরক্ত, মনোনীত আহমদ-(সঃ) পথের ধূলা।'
ঈমান রয়েছে মোদের সব আদেশের প্রতি।
মন ও প্রাণ এ পথে উৎসর্গীত"
(ইযালাহ্ আওহাম, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৬৬)

'সব দিকে চিন্তা-চেতনাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ক্লান্ত হয়েছি মোরা॥
মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্মের মত কোন ধর্ম পাইনি সেরা॥
এমন কোন ধর্ম নেই, যে নিদর্শন দেখায়
এ ফল মোরা খেয়েছি মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাগান থেকে॥
আমরা স্বয়ং ইসলামকে অভিজ্ঞতা মূলে দেখেছি
জ্যোতিই জ্যোতি: ! ওঠো! দেখো! শুনিয়েছি মোরা॥
অন্যান্য ধর্মকে যখন দেখেছি তখন কোথাও জ্যোতি ছিলো না,
কেউ দেখিয়ে দিক যদি সত্যকে আমরা লুকিয়ে থাকি'॥
(আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ২২৪)

নিজের নবুওয়ত প্রসঙ্গে বলেন ঃ

'আমি, নাউযুবিল্লাহ্ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নবুওয়তের দাবী করছি বা কোন নতুন শরীয়ত নিয়ে এসেছি আমার নবুওয়ত দ্বারা এটা বুঝাচ্ছি না। আমার নবুওয়তের অর্থ কেবল আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে ও অনুসরণে লাভ হয়েছে বেশি বেশি ঐশী কথোপকথন ও বাক্যালাপ। যেহেতু ঐশী কথোপকথনে ও বাক্যালাপে আপনারাও বিশ্বাসী তাই এটা কেবল শব্দগত কলহ। অতএব আপনারা যে বিষয়ের নাম কথোপকথন ও বাক্যালাপ রাখেন আমি এর আধিক্যের নাম ঐশী আদেশের কারণে নবুওয়ত রাখি। ওয়ালিকুল্লি আন ইসত্বলাহা অর্থাৎ আর সব কিছুর জন্যে পরিভাষা রয়েছে' (হাকীকাতুল ওয়াহীর পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা-৬৮)।

'যেখানে যেখানে আমি নবুওয়ত বা রিসালতের অস্বীকার করেছি তা কেবল এ অর্থে করেছি, আমি স্বাধীন-স্বতন্ত্র কোন শরীয়তধারী নবী নই। আর আমি স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবীও নই। কিন্তু এসব অর্থে আমি আমার অনুসৃত রসূলের সাথে গোপন কল্যাণ লাভ করে আর নিজের জন্যে তাঁর (সঃ) নাম লাভ করে তাঁর (সঃ) মাধ্যমে খোদার পক্ষ থেকে অদৃশ্যের জ্ঞান লাভ করে রসূল ও নবী; কিন্তু কোন নতুন শরীয়তধারী নই'

তদুপরি 'আখবারে আম'-এ নিজের নিম্নোক্ত শেষ চিঠিতে লিখিতভাবে বলেন ঃ

'আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, আমি এমন নবুওয়তের দাবী করে থাকি যাতে ইসলামের সাথে আমার কোন সম্পর্ক বাকী থাকে না। আর এর অর্থ এই, আমি স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে এমন নবী মনে করি যাতে কুরআন করীমের অনুসরণের কোন প্রয়োজন পড়ে না আর নিজের আলাদা কলেমা ও আলাদা কিবলা বানাই এবং ইসলামী শরীয়তকে রহিত বলে নির্ধারণ করে থাকি। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ থেকে বেরিয়ে যাই-এ অভিযোগ সত্যি নয়। বরং এমন নবুওয়তের দাবী আমার নিকট কুফরী। আর আজ থেকে নয় বরং নিজের প্রত্যেকটি পুস্তকে লিখে আসছি, আমার এ ধরনের কোন নবুওয়তের দাবী নেই ' (আখবারে আম লাহোর, মে ২৩, ১৯০৮)

'এ বিষয়টিকে স্মরণ রাখ' নতুন শরীয়ত, নতুন দাবী ও নতুন নামের দিক থেকে আমি নবী ও রসূল নই। আর আমি রসূল এবং নবী অর্থাৎ পূর্ণ ছায়ার দিক থেকে। আমি সেই আয়না যাতে মুহাম্মদী (সঃ) আকৃতি ও মুহাম্মদী (সঃ) নবুওয়তের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি রয়েছে' (নুযূলুল মসীহ্, পৃষ্ঠা-৩)।

এসব উদ্ধৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট, আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ইসলামের বিরুদ্ধে কোন সমান্তরাল ধর্ম বা নতুন শরীয়তের দাবী করেন নি বরং তাঁর (আঃ) দাবী ছায়া ও প্রতিচ্ছবি নবুওয়তের আর এ মকাম ও মর্যাদা নবী (সঃ)এর অনুসরণ-অনুকরণে তিনি (আঃ) লাভ করার দাবী করেছেন। স্বাধীন-স্বতন্ত্র বা সরাসরি নবুওয়ত পাওয়ার দাবী নয়। তাঁর (আঃ) দাবী এই, তিনি এক দিক থেকে নবী আর এক দিক থেকে উম্মতী। কেননা, নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীসে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নওয়াস বিন সামআন (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে ৪ বার 'নবীউল্লাহ্' নির্ধারিত করেছেন (সহী মুসলিম বাব খরূজে দাজ্জাল)। আবার বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়াতে এ প্রতিশ্রুত মসীহ্কে 'ইমামুকুম মিনকুম' ও 'ফা আম্মাকুম মিনকুম' বাক্যাংশে উম্মতী হওয়ার যোগ্যতায় উম্মতের ইমামও নির্ধারণ করেছেন (বাব নুযূলে ঈসা)। আর মুসনাদ আহমদ হাম্বলের রেওয়ায়াত অনুযায়ী প্রতিশ্রুত ঈসাকেই 'ইউশিকু মান আশা মিনকুম আই ইয়ালকা ঈসাব্না মারইয়ামা ইমামান মাহ্দিয়্যান' বাক্যে ইমাম মাহদী নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১১)।

এসব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর দাবী উম্মতী নবুওয়তের, স্থায়ী নবুওয়তের নয়। যখন প্রথম থেকেই তিনি স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবী নন তখন কোন স্বতন্ত্র শরীয়তের দাবী কি করে হতে পারে? এসব দাবী তিনি সব সময়ই অস্বীকার করেছেন। অতএব তিনি লিখিতভাবে বলেছেন :

'যেখানে যেখানে আমি নবুওয়ত বা রিসালতের অস্বীকার করেছি তা কেবল এ অর্থে করেছি, আমি স্বাধীন-স্বতন্ত্র কোন শরীয়তধারী নবী নই। আর

আমি স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবীও নই। কিন্তু এসব অর্থে আমি আমার অনুসৃত রসূলের সাথে গোপন কল্যাণ লাভ করে আর নিজের জন্যে তাঁর (সঃ) নাম লাভ করে তাঁর (সঃ) মাধ্যমে খোদার পক্ষ থেকে অদৃশ্যের জ্ঞান লাভ করে রসূল ও নবী; কিন্তু কোন নতুন শরীয়তধারী নই' (ইশ্‌তেহার এক গলতি কা ইযালাহ, পৃষ্ঠা-৮ নেযারতে ইসলাহ্ ও ইরশাদ কর্তৃক মুদ্রিত) ।

যেহেতু এ ধরনের দাবী মৌলভী আবুল হাসান নদভীর কাছে খতমে নবুওয়তের পরিপন্থী ছিলো না এজন্যে আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা আর তাঁর লোকদের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি তাঁর (আঃ) প্রতি তার এ পুস্তকে এই অভিযোগ উত্থাপন করে দিয়েছেন যে, তাঁর (আঃ) দাবী নতুন শরীয়ত নিয়ে আসার এবং স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবী হওয়ার।

খাতামান্নাবীঈনের কোন কোন অর্থ সর্ববাদী সম্মত?

নদভী সাহেব এটা খুবই ভাল জানতেন, খাতামান্নাবীঈন আয়াতের আলোকে উম্মতের সর্ববাদীসম্মত মত কেবল এতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরে কোন শরীয়তধারী বা স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবী আসতে পারে না। যেভাবে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেব (রহঃ) বলেন- লা ইয়াতীবা'দাহূ নাবীয়্যুন মুসতাক্বিলুন বিত্তালাক্কা (আল্ খয়রুল কাসীর, পৃষ্ঠা-৮০)। আবার তিনি (নদভী সাহেব) এ-ও জানতেন, উম্মতে মুহম্মদীয়ার মাঝে নবী হওয়া খতমে নবুওয়তের পরিপন্থী নয়। কেননা, হযরত মুল্লা আলী আল্ কারী-আলায়হের রহমত খাতামান্নাবীঈন এর অর্থ করেছেন ঃ আল্ মা'না আল্লাহু লা ইয়া'তী বা'দাহূ নাবীয়্যুঁ ইযান্‌সিখু মিল্লাতাহূ ওয়ালাম ইয়াকুমিন উম্মাতিহী (মাওযুয়াতে কাবীর, পৃষ্ঠা ৫৯)। অর্থাৎ খাতামান্নাবীঈন আয়াতের এ অর্থই, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে এমন নবী আসতে পারে না, যে তাঁর (সঃ) শরীয়তকে রহিত করে এবং তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত না হয়। যদিও এমন নবীর আগমন যা শরীয়ত রহিত করে না এবং উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয় খাতামান্নাবীঈন আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আবার সেই মৌলভী সাহেব এটাও জানতেন, 'লা নাবীয়্যা বা'দী' হাদীসের ব্যাখ্যা উলামা এটাও করেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরে কোন নতুন শরীয়তধারী নবী আসতে পারে না যেভাবে হযরত ইমাম আলী আল কারী লিখেছেন-

হাদীস লা ওয়াহ্ইয়া বা'দী বাতিলুন লা আসলা লাহূ না'আম ওয়ারাদা লা নাবিয়্যা বা'দী মা'নাহু 'ইনদাল উলামাই লা ইয়াহ্‌দিসু বা'দাহূ" নাবিয়্যুন বিশারইন ইয়ানসিখু শার'আহূ (আল্ ইশাআত ফী আশারাতিস্ সা' আ, পৃষ্ঠা-২২৬)

অর্থাৎ এ হাদীস, 'আমার পরে ওয়াহী হবে না' বাতিল। যদিও 'লা নাবিয়্যা বা'দী' এসেছে। আলেমদের নিকট এর অর্থ এই, ভবিষ্যতে এমন কোন নবী জন্ম নিবে না, যে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শরীয়তকে মনসুখ বা রহিত করে।

"ইন্নান্নুবুওয়্যাতা তাতাজায়্যা ওয়া জুয্‌উম মিন্‌হা বাক্বিন বা'দা খাতামাল আম্বিয়ায়ি"।

(আল্ মাসাভী শরাহ্ আল মুয়াত্তা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৬, দিল্লীতে মুদ্রিত)।

অর্থাৎ নবুওয়ত বন্টনযোগ্য আর এর এক অংশ খাতামাল আম্বিয়ার পর অবশিষ্ট রয়েছে। তাঁর একথা সহী বুখারীর ভাষ্য 'লাম ইয়াবকা মিনান্নুবুওয়্যাতি ইল্লাল মুবাশ্‌শিরাত' অনুযায়ী অর্থাৎ নবুওয়তের মুবাশ্‌শিরাত কেবল অবশিষ্ট রয়েছে।

মৌলভী সাহেব জানতেন উম্মতে যে মসীহ মাওউদের আগমনের প্রতীক্ষা চলে আসছে। নবী (সঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী শরীয়াত ও স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবীর পদ মর্যাদায় আসবেন না। কেননা, শরীয়তী এবং স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবুওয়ত তো নবী (সঃ)-এর হাদীসের কারণে অবশিষ্ট থাকে নি আর তিনি কেবল মুবাশ্‌শিরাত বা সু-সংবাদ পাওয়ার কারণে নবী বলে কথিত হবেন এবং উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী হবেন। এ পদ-প্রাপ্তির দাবী করেছেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হিস সালাম।

খতমে নবুওয়ত বিষয়ে আমাদের ও মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেবের ধারণার মাঝে নীতিগতভাবে কোন মতভেদ নেই যে, তিনি এক দিক থেকে নবী এবং অন্য এক দিক থেকে উম্মতী হবেন। মতভেদ যদি থেকে থাকে তাহলে তা মসীহে মাওউদ-এর ব্যক্তিত্ব নিয়ে। আমাদের ধারণায় মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেব এ ধারণায় ভুলের মাঝে রয়েছেন যে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন। আর তিনি আসল দেহে পুনরায় অবতীর্ণ হবেন। আমাদের দৃষ্টিতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ঈসা (আঃ) অন্যান্য নবীদের ন্যায় ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন আর যে মসীহ্‌র অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো তিনি তাঁর অনুরূপ উম্মতে মুহাম্মাদীয়ারই এক ব্যক্তি। আমাদের দৃষ্টিতে এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব (আঃ)-এ সত্তায় পূর্ণ হয়েছে। মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেব আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার এ দাবীকে- তিনি এক দিক থেকে নবী আর এক দিকে থেকে উম্মতী খাতামান্নাবীঈন আয়াত ও লা নাবীয়্যা বা'দী হাদীসের পরিপন্থী তো দেখতে পান নি; কিন্তু যেহেতু তাঁকে গ্রহণ করার জন্যেও তার মন ঝুঁকে নি এজন্যে তিনি *ইয়াসুদ্দূনা আন সাবিলিল্লাহি* (যারা আল্লাহ্ পথ থেকে বিরত রাখে)- এর দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়ে তার (আঃ) প্রতি এ দাবী আরোপ করে দিয়েছেন, তিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবী হওয়ার দাবীদার। *(চলবে)*

অনুবাদ ঃ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

কাদিয়ান আওর উসকে মোকাদ্দাস মোকামাত
(কাদিয়ান ও এর পবিত্র স্থানসমূহ)

(চতুর্থ কিস্তি)

লাল কালির নিদর্শনওয়ালা কক্ষ

মসজিদে মোবারকের আদি অংশের পশ্চিম দিকে সিঁড়ির সাথে এই কক্ষ অবস্থিত। ১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই মোতাবেক ১৩০২ হিজরীর ২৭শে রমযান মাসের কথা। সেই সময় এই কক্ষ গোসলখানারূপে ব্যবহৃত হতো। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম এই কক্ষে পূর্ব-পশ্চিমে পাতা একটি চারপাইয়ে বিশ্রাম করছিলেন। তাজা প্লাষ্টারের দরুন কক্ষটি কিছুটা ঠান্ডা ছিল। চারপাইয়ে কোন বিছানা ও বালিশ ছিল না। হযরত আকদাস আলাইহিস সালাম বাম কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। বাম কনুই মাথার নিচে রাখা ছিল এবং তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল ডান হাত দ্বারা ঢাকা ছিল। আর হযরত (আঃ)এর একনিষ্ঠ খাদেম মুন্সী আব্দুল্লাহ্ সানাউরী নিচে বসে হযরত (আঃ) এর পা টিপছিলেন। এমন সময় হযরত আকদাস (আঃ) কাশ্ফী অবস্থায় (দিব্য দর্শনে) দেখেন যে, ভবিষ্যৎ যুগে সংঘটিত হবে এমন কোন কোন অমোঘ সিদ্ধান্ত হযরত (আঃ) নিজ হাতে লেখেন এবং তা দস্তখত করানোর জন্য সর্বশক্তিমান খোদাতাআলার সামনে পেশ করেন। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ -অনুবাদক) হাকিমের আসনে আসীন ছিলেন। তিনি তাঁর কলমকে লাল কালির দোয়াতে ডুবিয়ে প্রথমে এই লাল কালি তাঁর (হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম) দিকে ঝাড়লেন। অবশিষ্ট লাল কালি কলমের মুখে রয়ে গেল এবং তা দিয়ে অমোঘ সিদ্ধান্তসমূহ লেখা পুস্তকে দস্তখত করে দিলেন। খোদার আলৌকিকতার নিদর্শন দেখ। ঐ দিকে কাশ্ফী জগতে কলমের লাল কালি ঝাড়া দেয়া হলো এবং এদিকে তা বাহ্যিক অস্তিত্বে রূপান্তরিত হয়ে গেল। মুন্সী সাহেব ভীষণ আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে স্বচক্ষে দেখেন, হুযূরের হাঁটুর উপর লাল কালি একটি ফোটা পড়ে রয়েছে। তিনি তার ডান হাতের তর্জনী এই ফোটার উপর রাখলেন। এতে সেই ফোটা হাঁটু ও আঙ্গুলেও ছড়িয়ে পড়লো। তখন তিনি নিজ হৃদয়ে এই আয়াত স্মরণ করলেন- "সিবগাতাল্লাহি ওয়া মান আহ্সানু মিনাল্লাহি সিবগাতান' (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ১৩৯) অর্থ: আল্লাহ্র রং আমরা গ্রহণ করেছি এবং রং এর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ হতে উত্তম কে হতে পারে?-(অনুবাদক)। তিনি ভাবলেন, এটা যখন আল্লাহ্র রং তখন এতে সুগন্ধও থাকবে। কিন্তু এতে সুগন্ধ ছিল না। তখনও তিনি অবাক বিস্ময়ের ঘোরে ছিলেন। এমন সময় তিনি হুযূরের জামাতেও লাল কালির কয়েকটি তাজা ছিটা দেখতে পেলেন। তিনি অভিভূত হয়ে ধীরে ধীরে চারপাই থেকে উঠলেন এবং এ সকল ফোটা সন্ধানে ছাদের আনাচে-কানাচে তন্ন তন্ন করে দেখলেন। এ সময় তিনি একথাও ভাবলেন, হয়তবা টিকটিকির লেজ কেটে যাওয়ার দরুন এই রক্ত পড়েছে। কিন্তু তা ছিল সর্বশক্তিমান খোদার কাশ্ফী মো'যেযা। বাইরে এর কী সন্ধান পাওয়া যাবে? বেচারা চারপাই এ বসে গেলেন এবং আবার পা টিপার খেদমতে লেগে গেলেন। অল্প কিছুক্ষণ পরে হুযূর (আঃ) কাশ্ফের জগত থেকে জেগে গেলেন এবং মসজিদে মোবারকে চলে আসেন। মুন্সী সাহেব আবার পা টিপতে শুরু করলেন। এই ফাঁকে তিনি হযরতকে প্রশ্নও করে বললেন, হুযূর আপনার (আঃ) উপর এই লাল কালি কোথা থেকে পড়েছে? হুযূর অন্যমনস্ক হয়ে বলেন, আমের রস হবে। মুন্সী সাহেব পুনরায় নিবেদন করলেন, এটা আমের রস নয়। এটাতো লাল কালি। এতে হুযূর (আঃ) তাঁর পবিত্র মাথা সামান্য উঠিয়ে বলেন, 'কিথ্থে হ্যায়' অর্থাৎ কোথায়। মুন্সী সাহেব জামার সেই চিহ্ন দেখিয়ে বলেন, এইতো সেই লাল কালি। এতে হুযূর (আঃ) জামা সামনের দিকে টেনে এনে এবং নিজের মাথা সেদিকে ঘুরিয়ে ফোটা দেখলেন। এরপর (মুন্সী সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী) পূর্বেকার বুযূর্গগণের কিছু ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, খোদার সত্তা পর্দার অন্তরালেরও অন্তরালে। তাঁকে এই চোখ দিয়ে পৃথিবীতে দেখা যায় না। অবশ্য তাঁর কোন কোন গুণ 'জামালী' বা 'জালালী'ভাবে (অর্থাৎ স্নেহময়রূপে বা রুদ্ররূপে-অনুবাদক) মূর্তিমান হয়ে বুযূর্গগণকে দেখিয়ে দেয়া হয়। খোদা-দর্শন এবং কাশ্ফী বিষয়ের বাহ্যিক বিকাশ সম্পর্কে ঘটনাবলী উল্লেখ করার পর হযরত আকদাস (আঃ) কাশ্ফটি তাকে বিস্তারিতভাবে শুনিয়ে দেন। বরং খোদা নিজের পবিত্র হাতে কাশ্ফে কলম ঝাড়ার ও দস্তখত করার চিত্রও আঁকেন। হযরত (আঃ) মুন্সী সাহেবকে বলেন -

আপনি নিজের জামা ও টুপি দেখে নিন, এগুলোতেও লাল কালির ফোটা পড়েছে কীনা। তিনি জামা দেখলেন। তা সম্পূর্ন পরিষ্কার ছিল। কিন্তু মলমলের সাদা টুপির উপর এক ফোটা পড়ে ছিল। মুন্সী সাহেব বিনয়ের সাথে আবেদন করলেন, হুযূর আপনার এই সম্মানপ্রাপ্ত জামাটি তবারক স্বরূপ আমাকে দান করুন। হযরত আঁকদাস কেবল তাঁর সেবকদের সাথেই নয়, তাঁর শত্রুদের সাথেও স্নেহ ও দয়ার সাথে আচরণ করতেন। কিন্তু তিনি (আঃ) মুন্সী সাহেবের এই আবেদন নাকচ করে দিলেন এবং বললেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমার মৃত্যুর পর এর দ্বারা শিরক ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকেরা একে জেয়ারতগাহ্ বানিয়ে এর পূজা শুরু করে দিবে। তিনি নিবেদন করলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তবারকসমূহও তো সাহাবাগণ রাখতেন। এতে শিরক ছড়ায়নি। হযরত আকদাস বললেন, 'মিঞা আব্দুল্লাহ্ প্রকৃত কথা হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তবারকসমূহ যে সকল সাহাবীর কাছে ছিল তাঁরা মৃত্যুর সময় ওসিয়্যত করে গিয়েছিলেন সেই সব তবারক যেন তাদের কফিনের সাথে দাফন করে দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এমনটিই করা হয়েছিল। যে তবারক যে সাহাবীর কাছে ছিল তা তাঁর কফিনের সাথে দাফন করে দেয়া হয়েছিল।' তিনি আবেদন করলেন, হুযূর আমিও মৃত্যুর সময় ওসিয়্যত করে যাব। এতে হযরত আকদাস বলেন, 'হাঁ যদি এই প্রতিজ্ঞা কর তবে নিয়ে নাও।' বস্তুতঃ হযরত (আঃ) জুমুআর জন্য কাপড় বদলালেন এবং এই জামা মুন্সী সাহেবের কাছে সোপর্দ করে দিলেন। এই সম্মানপ্রাপ্ত জামার কাপড়কে 'নেনু' বলা হয় এবং কালির রং ছিল হালকা গোলাপী। তেতাল্লিশ বছরের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এই রং এ সামান্য পরিবর্তনও হয়নি।

বাইতুল ফিক্‌র

বাইতুল ফিক্‌র সেই কক্ষ, যা মসজিদে মোবারক সংলগ্ন উত্তর দিকে অবস্থিত। আর এই কক্ষের প্রস্থ প্রায় দশ ফুট এবং দৈর্ঘ্য তের ফুট ছয় ইঞ্চি। এই কক্ষে প্রবেশের জন্য মসজিদে মোবারকের জানালা ছাড়াও পশ্চিম দিকে একটি দরজা এবং উত্তর দিকে অন্য একটি দরজা রয়েছে। এটা সেই বরকতমন্ডিত কক্ষ, যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম শুরুর দিকে প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে নিমগ্ন থাকতেন। এই কক্ষেই তিনি (আঃ) তাঁর জ্ঞানপূর্ণ ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রণয়ন করেন। এই কক্ষ সম্পর্কে ১৮৮২ সালে হুযূরের (আঃ) কাছে ইলহাম হয়েছিল, **'আলাম নাজয়াল লাকা সুহুলাতান ফী কুল্লি আমরিন বাইতুল ফিকর** (তাজকেরা পৃষ্ঠা ১০৫)। 'আমরা কি সকল বিষয় তোমার জন্য সহজ করে দেইনি? আর তোমাকে বাইতুল ফিক্‌র দান করেছি।'

এই কক্ষ দোয়া ও নফল আদায়ের জন্য সর্বদা খোলা থাকে। ফরজ নামাজগুলোর সময় মহিলাগণ এই কক্ষে নামায আদায় করে থাকেন। অবশিষ্ট সময় পুরুষগণও এই কক্ষে নফল আদায় করতে পারেন। নফল নামাযের সময় না থাকলে হাত উঠিয়ে 'মসনুন' পন্থায় দোয়া করা যেতে পারে।

হযরত আম্মাজান রাযী আল্লাহুতাআলা আনহার দালান

বাইতুল ফিক্‌রের উত্তর দিকে তুলনামূলকভাবে একটি বড় কক্ষ রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় তেইশ (২৩) ফুট এবং প্রস্থ বার (১২) ফুট। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) এই কক্ষ সম্পর্কে বলেন, 'বাইতুদ্‌দোয়া সংলগ্ন পূর্বে অবস্থিত দালানটি খুবই ঐতিহাসিক ও পবিত্র । এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন এবং পরবর্তীতে হযরত আম্মাজান এখানেই থাকতেন। এখানে অনেক ইলহাম হয়েছে। বরং আম্মাজান (রাঃ) এই কক্ষকে বাইতুল ফিকরের অন্তর্ভুক্ত বলে অভিহিত করে থাকেন। তিনি আরো বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামও এই কক্ষকে বাইতুল ফিকরের অংশ বলে গণ্য করতেন।

এই কক্ষও দোয়া নফল আদায়ের জন্য খোলা থাকে। (পরিশিষ্ট, আসহাবে আহমদ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১)।

বাইতুদ্‌দোয়া (দোয়ার গৃহ) ঃ

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব রাযীআল্লাহুতাআলা আনহু লিখেনঃ

"দোয়ার ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলইহিস সালামের একটি বৈশিষ্ট ছিল, তিনি সফরেই থাকুন বা গৃহেই থাকুন দোয়ার জন্য একটি বিশেষ জায়গা তেরী করে নিতেন এবং একে বাইতুদ্‌দোয়া বলা হতো। আমি হযরত (আঃ) এর সাথে যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দেখেছি তিনি (আঃ) দোয়ার জন্য একটি পৃথক জায়গা অবশ্যই ঠিক করে নিতেন এবং দৈনন্দিন কর্মসূচীতে সর্বদা এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতো, একটি সময় দোয়ার জন্য পৃথক করে নিতেন। কাদিয়ানে শুরুর দিকে তিনি (আঃ) তাঁর সেই উচুঁ ছাদেই দোয়ায় নিমগ্ন থাকতেন, যা তাঁর (আঃ) থাকার জন্য নির্ধারিত ছিল। এরপর বাইতুয জেকেরকে (মসজিদে মোবারকে) এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্ধারিত করা হলো। আল্লাহ্‌তাআলার চিরাচরিত ইচ্ছা যখন বাইতুয জিকেরকেও সাধারণ ইবাদতের স্থান বানিয়ে দিল এবং নির্জনতা আর রইলো না তখন তিনি (আঃ) ঘরে একটি বাইতুদ্‌দোয়া তৈরী করেন। এই বাইতুদ্‌দোয়া এখনও বিদ্যমান রয়েছে। যখন ভূমিকম্প এলো এবং হুযূর (আঃ) কিছু দিনের জন্য বাগানে চলে গেলেন তখন সেখানেও এই উদ্দেশ্যে একটি কক্ষ নির্মাণ করে নেন। মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে (আঃ) কিছুদিনের জন্য গুরুদাসপুরে থাকতে হয়েছিল। সেখানেও তাঁর (আঃ) জন্য বাইতুদ্‌দোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।"

(সীরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাহিস , সালাম ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৫)।

উপরোল্লিখিত বাইতুদ্‌দোয়াসমূহের মাঝে সেই কক্ষটিও "বাইতুদ্‌দোয়া," যার ভিত্তি হুযূর (আঃ) তাঁর মৃত্যুর কমবেশি পাঁচ বছর আড়াই মাস পূর্বে রেখেছিলেন। হযরত আম্মাজান (রাঃ) এর দালানের পশ্চিম দিকে এই ছোট খাটো কক্ষটি অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৪ ফুট। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এর দু'টি দরজা রয়েছে। হযরত আম্মাজানের (রাঃ) দালান থেকে এতে প্রবেশের জন্য কাঠের তৈরী সিড়ির চার কদম উপরের উঠতে হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম এই বাইতুদ্‌দোয়া নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত কথাগুলো লিখেন ঃ

"আমি ভাবলাম জীবনের কোন ভরসা নেই। আমার বয়স প্রায় সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত করা নেই। খোদা জানেন মৃত্যু কখন এসে যাবে। কিন্তু আমার কাজ এখনো অনেক বাকী রয়ে গেছে। এ দিকে কলমের শক্তি দূর্বল হয়ে এসেছে। তলোয়ার ধারণের ব্যাপারে খোদাতাআলার সম্মতি ও ইচ্ছা নেই। অতএব আমি আকাশের দিকে হাত উঠালাম এবং তাঁর কাছ থেকে শক্তি লাভের জন্য একটি পৃথক কক্ষ তৈরী করলাম। আর খোদার কাছে দোয়া করলাম যেন আমার গৃহ সংলগ্ন এই মসজিদকে এবং বাইতুদ্‌দোয়াকে শান্তি ও নিরাপত্তার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল দলিল ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে বিজয়ের গৃহ বানিয়ে দেন।"

(জিক্‌রে হাবিব, লেখক: হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব, পৃষ্ঠা-১০৯)।

বাইতুদদোয়াতে দোয়া করার সময় এই লক্ষ্যকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম এটা নির্মাণের সময় বর্ণনা করেছিলেন। সব চেয়ে প্রথমে ইসলামের বিজয় এবং আহমদীয়াতের জন্য বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে দোয়া করা উচিত। আর বিশেষভাবে এই দোয়া করা উচিত। হে আল্লাহ! হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম এই কক্ষে যত দোয়া করেছিলেন এর সবগুলো কবুল করে এর ফলসমূহ জামাতকে এবং সারা বিশ্বের মানুষকে দান করতে থাক। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আইয়াদাল্লাহুতাআলাকে সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, দীর্ঘায়ূ এবং তাঁর সকল উদ্দেশ্যকে সফলতা দান কর। এ সকল দোয়ার পর নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের জন্যও দোয়া করা উচিত।

"দোয়ার ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলইহিস সালামের একটি বৈশিষ্ট ছিল, তিনি সফরেই থাকুন বা গৃহেই থাকুন দোয়ার জন্য একটি বিশেষ জায়গা তেরী করে নিতেন এবং একে বাইতুদ্‌দোয়া বলা হতো। আমি হযরত (আঃ) এর সাথে যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দেখেছি তিনি (আঃ) দোয়ার জন্য একটি পৃথক জায়গা অবশ্যই ঠিক করে নিতেন এবং দৈনন্দিন কর্মসূচীতে সর্বদা এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতো, একটি সময় দোয়ার জন্য পৃথক করে নিতেন।

বাইতুর রিয়াযত (সাধনার গৃহ)

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের শুরুতে একজন পবিত্র বুযূর্গের চেহারা স্বপ্নে দেখেন। এই বুযূর্গ হুযূর (আঃ) কে বলেন, স্বগীয় জ্যোতিঃ লাভের জন্য কিছুদিন রোযা রাখা খানদানে নবুওয়তের সুন্নত। এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে হুযূর যেন আহ্‌লে বয়াতে রেসালতের সুন্নত আদায় করেন। অতএব তিনি (আঃ) আট অথবা নয় মাস পর্যন্ত গোপনীয়তার সাথে রোযা রাখার সাধনা করেন। নিম্নলিখিত ভাষায় হুযূর (আঃ) এর বর্ণনা দেন ঃ

"অতএব আমি কিছুদিন পর্যন্ত রোযা রাখা সমীচীন মনে করলাম। কিন্তু সাথে সাথে এ ধারণাও মনে এলো এই রোযা গোপনীয়তার সাথে পালন করা উত্তম হবে। সুতরাং আমি এই পদ্ধতি অবলম্বন করলাম যে, পুরুষ মহল থেকে নিজের খাবার চেয়ে নিতাম এবং সেই খাবার গোপনীয়তার সাথে কিছু এতীম শিশুকে দিয়ে দিতাম। এসব এতীম শিশুকে আমি পূর্বেই যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বলে দিয়েছিলাম। এভাবে সারাদিন রোযা রাখতাম এবং খোদাতাআলা ছাড়া এ সকল রোযার কথা কেউ জানতো না। অতঃপর দু'তিন সপ্তাহ পরে আমার মনে হলো, এই যে এক বেলা পেট ভরে রুটি

খেয়ে নিচ্ছি এতে তো আমার কোন কষ্টই হচ্ছে না। খাবার কিছুটা কমিয়ে খাওয়াটাই উত্তম হবে। অতএব সেদিন থেকে আমি খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দিতে থাকি। এমনকি আমি সারাদিনে ও রাতে কেবল একটি রুটি দ্বারা খাবার কাজ চালিয়ে দিতে থাকি। আর এভাবেই আমি খাওয়া কমিয়ে দিতে থাকলাম। এমনকি ২৪ঘন্টায় আমার খাবার ছিল সম্ভবতঃ কয়েকতোলা রুটি। প্রায় আট নয় মাস পর্যন্ত আমি এমনটিই করেছি। যে ক্ষেত্রে দু'তিন মাসের একটি শিশুও এই সামান্য খাদ্যে ধৈর্য ধরতে পারেনা সেক্ষেত্রে আল্লাহ্তাআলা আমাকে সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। আর এ ধরনের রোযার আশ্চর্য্যজনক ঘটনাবলীর যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা হলো সূক্ষ্ম দিব্যদর্শন, যা আমাকে দেখানো হয়েছে। বস্তুত: অতীতের কোন কোন নবীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আর এ উম্মতের উচুঁ পর্যায়ের যে ওলী-আল্লাহ্গণ গত হয়েছেন তাঁদের সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। একবার ঠিক জাগ্রত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, একই সাথে হুসাইন (রাঃ) এবং ফাতেমা রাযীআল্লাহু আন্হাকে দেখলাম। এটা স্বপ্ন ছিলনা, বরং এক ধরনের জাগ্রত অবস্থা ছিল। এভাবে কয়েকজন পবিত্র ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এঁদের কথা উল্লেখ করলে পুস্তকের কলেবর বেড়ে যাবে। এতদ্ব্যতীত তাঁর আধ্যাত্মিক জ্যোতি প্রতিবিম্বরূপে এরূপ চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর সবুজ ও লাল স্তম্ভের আকারে দেখছিলাম এর বর্ণনা দেয়া সম্পূর্ণরূপে আমার লেখনী শক্তির বাইরে। সেই জ্যোতির স্তম্ভসমূহ সরাসরি আকাশের দিকে চলে গিয়েছিল। এ সকল স্তম্ভের কোন কোনটি ছিল চোখ ধাঁধানো সাদা, কোন কোনটি সবুজ এবং কোন কোনটি লাল। হৃদয়ের সাথে এগুলোর এরূপ সম্পর্ক ছিল যে, এগুলো দেখে হৃদয় আনন্দে ভরে গিয়েছিল। এগুলো দেখে হৃদয় ও আত্মা যেভাবে আনন্দে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল তেমন কোন আনন্দ এ পৃথিবীতে হতেই পারে না। আমার ধারণা এ সকল স্তম্ভ খোদা ও বান্দার ভালবাসার মিলনে এক প্রতিবিম্ব আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল এবং অন্যটি ছিল সেই জ্যোতিঃ যা উপর থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর উভয়ের মিলনের দরুন একটি স্তম্ভের আকার সৃষ্টি হয়েছিল। ঐটা আধ্যাত্মিক বিষয়। জগদ্বাসী এটা বুঝে না কিন্তু পৃথিবীতে এমন ব্যক্তিরাও রয়েছেন, যারা এর তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এতগুলো রোযা রাখার দরুন যে সকল আশ্চর্য্যজনক ঘটনাবলী আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো ছিল বিভিন্ন ধরণের কাশ্ফ (দিব্য দর্শন)"(কিতাবুল বারীয়া, পৃষ্ঠা-১৬৪)।

এ ধরনের রোযার আশ্চর্য্যজনক ঘটনাবলীর যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা হলো সূক্ষ্ম দিব্যদর্শন, যা আমাকে দেখানো হয়েছে। বস্তুত: অতীতের কোন কোন নবীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আর এ উম্মতের উচুঁ পর্যায়ের যে ওলী-আল্লাহ্গণ গত হয়েছেন তাঁদের সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। একবার ঠিক জাগ্রত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, একই সাথে হুসাইন (রাঃ) এবং ফাতেমা রাযীআল্লাহু আন্হাকে দেখলাম।

হুযূর (আঃ) যে কক্ষে আট বা নয় মাস রোযা রাখেন তাকে 'বাইতুর রিয়াযত' বলা হয়। নফল আদায়ের এবং দোয়া করার জন্য এই কক্ষও খোলা থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম যে কক্ষে জন্মগ্রহণ করেন

সৈয়্যদনা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম পৈতৃক গৃহ অর্থাৎ 'আদ্-দার' এর একটি কক্ষে ১২৫০ হিজরীর ১৪ই শাওয়াল মোতাবেক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ইং ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত আল্ মুসলেহ্ মাওউদ রাযী আল্লাহুতাআলা আন্হু যে কক্ষে জন্মগ্রহণ করেন

'আদ্দার' এর এই বেষ্টনীরই অন্য একটি কক্ষে সৈয়্যদনা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব রাযী আল্লাহুতাআলা আন্হু ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন।

মসজিদে আক্সা

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের পিতা মরহুম হযরত মির্যা গোলাম মর্তুজা সাহেব মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে দুই বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে একটি উচুঁ ও সুবিধাজনক জমি সাত শত টাকায় ক্রয় করেন এবং ১৮৭৫ সালে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। একেই "মসজিদে আক্সা" বলা হয়। ১৮৭৬ সালে এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এটা সেই সময়ের কথা যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ বছর। আর সেই সময় না ছিল তাঁর (আঃ) কোন দাবী এবং না জামাত। কাদিয়ানে পূর্ব থেকেই অনেক মসজিদ বিদ্যমান থাকায় এই মসজিদ নির্মিত হতে দেখে কোন এক ব্যক্তি বললো, এত বড় মসজিদের কী প্রয়োজন ছিল? এতে কে নামায পড়বে? এতে চামচিকাই বসবাস করবে। কিন্তু আল্লাহ্তাআলার ফেরেশতাগণ সেই সময় এই কথা শুনে হেসে থাকবেন এবং বলে থাকবেন, বাহ্যতঃ দেখতে বড় হলেও এই মসজিদ ভীড়ের আধিক্যে সদা-সর্বদা ছোটই হতে থাকবে।

এই মসজিদের পূর্বেকার পুরাতন দালান এবং এর আঙ্গিনা ও চার কোন নিজ নিজ জায়গায় সেভাবেই বিদ্যমান রয়েছে যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের যুগে ছিল। ১৮৭৬ সালের ২রা জুনে হযরত মির্যা গোলাম মর্তুজা সাহেবের মৃত্যু হলো। তাঁর ওসিয়্যত অনুযায়ী তাঁকে এই মসজিদ সংলগ্ন এক কোনায় সমাহিত করা হলো (হে আল্লাহ! তুমি তাঁর উপর দয়া কর এবং তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাও)।

মসজিদের পূর্বেকার দালানে প্রায় দু'শত লোক নামায আদায় করতে পারতো। পরবর্তীতে যখন আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হলো তখন লোকজন বিপুল সংখ্যার কাদিয়ানে আসতে লাগলো তখন এই মসজিদে নামাযীদের জন্য স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। বস্তুত : ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মসজিদের আঙ্গিনা পূর্বদিকে এতখানি সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন দেখা দিল যে, হুযূরের শ্রদ্ধেয় পিতার কবর মসজিদের আঙ্গিনায় এসে গেল। আসল কবর মসজিদের বর্তমান আঙ্গিনার ছয়/সাত ফুট নীচে অবস্থিত। এ জন্য কবরের চারদিকে চারটি প্রাচীর নির্মাণ করে একে উপর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যেন মানুষ কবরের উপর দিয়ে চলাফেরা না করে এবং এর অসম্মান না করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মসজিদে আকসার আঙ্গিনার যে সম্প্রসারণ করা হয়েছিল তাতে সাদা তারকাচিহ্নিত ইট, ব্যবহার করা হয়েছিল। আর এ চিহ্ন এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এই সম্প্রসারণের পর মসজিদে দুই হাজার নামাযীর জন্য স্থান সংকুলান হয়ে গেল। ১৯১০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল রাযীআল্লাহু আন্হুর যুগে মসজিদে আকসার দালান দ্বিতীয়বার সম্প্রসারিত হলো এবং তৃতীয়বার সম্প্রসারিত হলো ১৯৩৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী রাযীআল্লাহুতাআলা আন্হুর যুগে। ১৯৩৮ সালের ৭ইং জানুয়ারীতে এই মসজিদে সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ রাযীআল্লাহুতাআলা আন্হু জুমুআর খুতবা প্রদানের জন্য প্রথমবার লাউড স্পীকার ব্যবহার করেছিলেন। *(চলবে)*

মূল ঃ মুহাম্মদ হামীদ কাওসার
অনুবাদ ঃ নাজির আহমদ ভূঁইয়া

হযরত হাফেয হেকীম মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ)

(২য় কিস্তি)

কুরাইশী আমীর আহমদ সাহেব ভেরভী বলেন-আমাদের সামনেই শেখ মুহাম্মদ খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)কে 'ছুটি রেসাঁ' বইটি দেন। এর মূল্য ১৬ টাকা ছিল। খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বললেন- এ বই আমার খুবই প্রিয়। আমি খুবই শখ করে এটি আনিয়েছি। কিন্তু এখন এর মূল্য পরিশোধের টাকা আমার কাছে নেই। তবে আমার খোদার আমার সাথে এমন এক সম্পর্ক রয়েছে, এই ষোল টাকা চলে আসবে আর এখনই চলে আসবে। তখন আমরা বসেই ছিলাম, এক হিন্দু তার অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে আসলো। হুযূর ঔষধের ব্যবস্থাপত্র (প্রেসক্রিপশন) লিখে দিলেন। হিন্দু লোকটি একটি স্বর্ণ-মুদ্রা ও এক টাকা রেখে চলে গেল। তিনি (রাঃ) ঐ সময়ই শুকরিয়া জ্ঞাপনার্তে সিজদা করলেন আর বললেন-আমি আমার খোদার উপর আত্মোস্বর্গকৃত। তিনি আমাকে তোমাদের সামনে লজ্জা দেননি। এ লোক যদি আমাকে কিছু নাও দিতো তবুও আমি চাইতে পারতাম না। কেননা আমার চাওয়ার অভ্যাস নেই। তারপর এটাও হতে পারতো ঐ লোক এক টাকা দিয়েছে বা শুধু একটা স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়েছে। যাহোক আমার খোদা তাকে বাধ্য করেছেন, আমার নূরুদ্দীনের ষোল টাকা প্রয়োজন। এজন্য স্বর্ণ-মুদ্রার সাথে অবশ্যই টাকাও দাও! (তারীখে আহমদীয়াত, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৫৫৬)।

এভাবে তিনি (রাঃ) বলেন-

"জম্মুতে হাকিম নামে এক হিন্দু আতর ব্যবসায়ী ছিল। ঐ ব্যক্তি সর্বদাই উপদেশ দিতো প্রত্যেক মাসে একশ টাকা নিজের কাছে জমা করো। এখানে অনেক বিপদ আপদ আসে। আমি সর্বদাই এটা বলে উত্তর দিতাম, এমন চিন্তা-ভাবনা করা আল্লাহ্ সম্পর্কে উপর মন্দ ধারণা করা। ইন্শাআল্লাহ্, আমার উপর কখনও বিপদ আপদ আসবে না। যে দিন সেখান থেকে চলে আসি ঐ দিন সে আমার নিকট আসলো। আর আমাকে বললো-হয়তো আজ আপনার আমার উপদেশ মনে পড়বে। আমি বললাম তোমার উপদেশকে আমি যেভাবে পূর্বে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতাম আজও সেভাবে দেখি। সে আমার সাথে কথা বলে যাচ্ছিল এমন সময় ব্যাংক থেকে চারশত আশি টাকা আমার কাছে আসলো। আর বলা হলো এটা আপনার ঐ সময়ের বেতন। এ আতর বিক্রেতা অফিসারকে গালি দিয়ে বললো-দেখ, নূরুদ্দীন তো তোমাদের ব্যাপারে অভিযোগ করে যাচ্ছিল। তখনও সে তার রাগকে সংযত করতে পারেনি, এমন সময় এক রানী সাহেবা আমার কাছে অনেক টাকা পাঠালেন আর বললেন, এ সময়ে আমাদের কাছে এর চেয়ে বেশি টাকা নেই। এটা আমাদের পকেট খরচের টাকা ছিল। যা ছিল এর পুরোটাই আপনার খেদমতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এরপর এই লোকের রাগ আরও বেড়ে গেল। আমার এক লোককে ১,৯৫,০০০/-(এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা দেবার কথা ছিল। আতর ব্যবসায়ী ঐ দিকে ইঙ্গিত করে বললো, যাকে আপনার প্রায় দুই লক্ষ টাকা দেবার কথা সে এটা ছাড়া কিভাবে আপনাকে শান্তিতে যেতে দিবে?

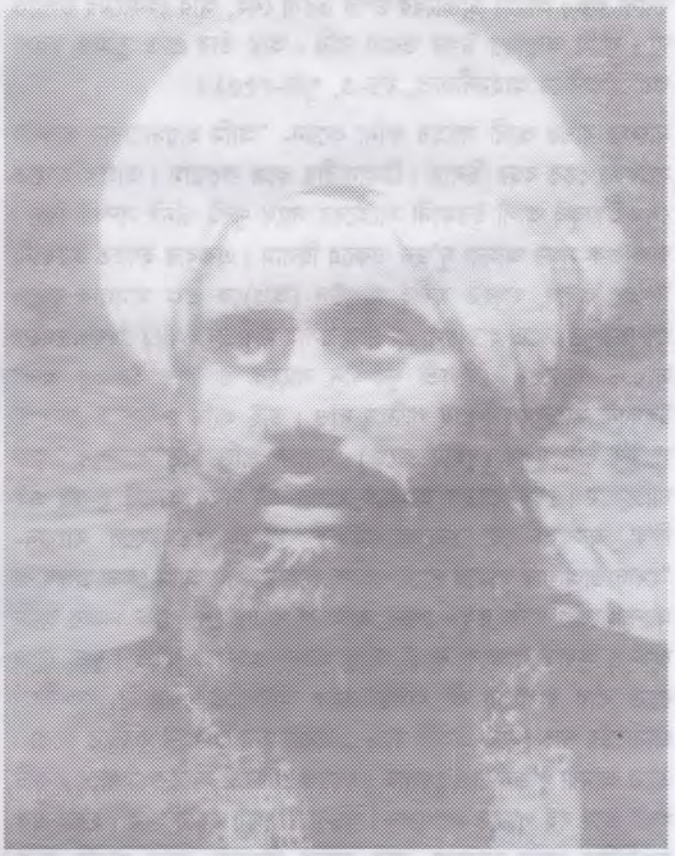

ঐ সময়েই তার লোক আসলো আর খুবই নম্রতার সাথে হাত জোড় করে বলতে লাগলো, এখনই আমার কাছে টেলিগ্রাম এসেছে। আমার মালিক বলেছেন-মৌলভী সাহেবকে তো যেতে হবে। তাঁর কাছে টাকা না থাকতে পারে। এজন্য তাঁর সব জিনিসপত্র ঘরে পৌঁছে দাও। আর এ জন্য যত টাকা তাঁর প্রয়োজন হয় দিয়ে দাও। জিনিসপত্র যদি তিনি নিয়ে যেতে না পারেন তাহলে তুমি তোমার ব্যবস্থাপনায় নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দাও। আমি বললাম, আমার টাকার প্রয়োজন নেই। ব্যাংক থেকে টাকা এসেছে। আর এক রানীও পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি টাকা আছে। আর জিনিসপত্র সব আমি সাথেই নিয়ে যাব। সম্ভবতঃ ঐ সময় আমার কাছে ১,২০০/-(এক হাজার দুইশত) বা এর চেয়ে বেশি টাকা এসে গিয়েছিল। এই হিন্দু আতর ব্যবসায়ী দাড়িয়ে গেল আর বলতে লাগলো পরমেশ্বরেরও ন্যায় বিচার থাকা দরকার। লোকেরা সকাল থেকে সন্ধ্যা কতই না পরিশ্রম করে ! এরপর অনেক কষ্টে অর্থের দর্শন ভাগ্য জুটে। আর এ নির্বোধটাকে দেখ, নিজে তো টাকার খোজ করেই না, পক্ষান্তকে তাকে দেয়া হচ্ছে। আমি বললাম খোদাতাআলা হৃদয়কে জানেন। ইন্শাআল্লাহ্ আমি খুব শিগ্রই তার টাকা আদায় করে দিব। তুমি এর গূঢ়তথ্য বুঝতে পারবে না" (মিরকাতুল একীন পৃ: ১৯০)

একবার তাঁর (রাঃ) অসুস্থতার সময় হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী নিবেদন করলেন, সম্মতি দিলে রাজ্যের বিজ্ঞ ডাক্তারকে দিল্লী থেকে ডেকে নিয়ে আসা যেতে পারে। তিনি বললেন " খোদার উপর ভরসা কর। আমার ডাক্তারের উপর ভরসা নেই, আর হেকীমের উপরও না। আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করি। আর তাঁর প্রতি তুমিও ভরসা কর" (তারীখে আহমদীয়াত, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৫৫)।

মালেক বশির আলী সাহেব বর্ণনা করেন- "আমি হায়দারাবাদ দক্ষিণে সম্ভবতঃ তের বছর ছিলাম। ঠিকাদারীর কাজ করতাম। আমার হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেবের সাথে খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। আর এক সময় আমরা দু'জন একত্রে ছিলাম। একবার হযরত ইরফানী সাহেব বল্লেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে এক মামলার কাজে গুরুদাসপুর যেতে হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সেখান থেকে সংবাদ পাঠালেন, মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব ও শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেবকে শিগ্রই পাঠিয়ে দাও। তাই আমি ও হযরত মৌলভী সাহেব বাদ দুপুর (দুইটা বাজে) ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বাটালার দিকে যাচ্ছিলাম। শেখ সাহেব আমাকে বলেন-এই সময় আমার হৃদয়ে এই চিন্তা আসলো যে, হযরত মৌলভী সাহেব তো বলে থাকেন- "খোদাতাআলার আমার সাথে ওয়াদা রয়েছে, যদি আমি কোন জঙ্গল বা মরুভূমিতেও থাকি তবুও খোদা আমাকে খাবার পৌছাবেন। আর আমি কখনও ক্ষুধার্ত থাকবো না।" আজ আমরা অসময়ে যাচ্ছি। বুঝা যাবে রাত্রে তাঁর খাবারের কী ব্যবস্থা হয়? বাটালাতে মোকামী (কেন্দ্রীয়) জামাতের পক্ষ থেকে একটি বাড়ি মেহমানখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এতে আমরা দু'জন চলে গেলাম। হযরত মৌলভী সাহেব সেখানে একটি খাটে শুয়ে বই পড়তে লাগলেন। সম্ভবতঃ সন্ধ্যা ছয়টা হবে। হঠাৎ এক অপরিচিত লোক আসলো, আর বলতে লাগলো, আমি শুনেছি আজ মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব এখানে এসেছেন। তিনি কোথায়? আমি বললাম, তিনি তো শুয়ে আছেন। সে বলতে লাগলো, হুযূর! আমার একটি নিবেদন, আজ সন্ধ্যায় আমার ওখানে দাওয়াত কবুল করুন। আমি রেলওয়েতে কন্ট্রাকটারী করি। আর আমার ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। আমি অমৃতসর যাব। আমার চাকর হুযূরের জন্য খাবার নিয়ে আসবে। হযরত মৌলভী সাহেব বল্লেন- ঠিক আছে। সুতরাং সন্ধ্যার সময় তার চাকর যথারীতি খাবার নিয়ে এলো। আর আমরা দু'জন খুবই পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে নিলাম। শেখ সাহেব বলতে লাগলেন- আমার চিন্তা হলো তাঁর কথা তো সত্য হয়ে গেল। তাঁকে খোদা অসময়ে খাবার পাঠিয়ে দিলেন। যেহেতু গাড়ি রাত দশটার পর ছাড়বে। তাই আমি হযরত মৌলভী সাহেব কে নিবেদন করলাম- অন্ধকার হচ্ছে। পরে শ্রমিক পাওয়া যাবে না। আমরা কোন শ্রমিককে ডেকে নেই। আর স্টেশনে পৌঁছে যাই। সেখানে গিয়ে ওয়েটিং রোমে বিশ্রাম করে নেব। মৌলভী সাহেব বললেন-খুবই ভাল। সুতরাং আমি এক শ্রমিককে ডাকলাম। সে আমাদের দু'জনের বিছানা স্টেশনে পৌঁছে দিল। যেহেতু গাড়ি রাত দশটার পরে আসবে তাই আমি তাঁর বিছানা খোলে দিলাম যাতে তিনি বিশ্রাম নিতে পারেন। যখন আমি বিছানা খোললাম তখন এর ভেতরে কাগজে মুড়ানো দু'টি পরটা বের হলো। (আল্লাহ্ এর সাক্ষি)। এর সাথে ভূনা মাংসও রাখা ছিল। আমি খুবই আশ্চার্য্যান্বিত হলাম। আর মনে মনে বললাম সেই খাবার আমারা খেয়ে ফেলেছি, আর খোদার পক্ষ থেকে এখন আরও খাবার এসে গেছে। কেননা এ খাবার সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না। **আমি হযরত মৌলভী সাহেবকে নিবেদন করলাম, হুযূর আমরা যখন কাদিয়ান থেকে যাত্রা করেছিলাম তখন যাত্রা হঠাৎ ও অসময়ে ছিল। আমি মনে মনে চিন্তা করেছিলাম আজ দেখবো মৌলভী সাহেবের খাবার কোথা থেকে আসে? সুতরাং প্রথমে দাওয়াত পেয়েছেন আর এখন বিছানা থেকে পরটা বের হয়ে এসেছে। হযরত মৌলভী সাহেব বললেন- "মৌলভী সাহেব! আল্লাহ্‌তাআলাকে পরীক্ষা করো না। আর খোদাকে ভয় কর। তাঁর আমার সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে** (হায়াতে নূর, পৃ: ২৭৫,২৭৭)।

কুরআনের ভালবাসা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর জীবনের আরেকটি বিশেষ দিক ছিল তাঁর কুরআনের প্রতি অতুলনীয় অনুরাগ ও ভালবাসা। তিনি কুরআন করীমের সত্যিকার প্রেমিক ছিলেন। নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতেন, কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতেন, আর যেখানেই থাকতেন না কেন কুরআনের দরসের ধারাবাহিকতা চালু রাখতেন। এটা তাঁর জীবনের প্রতিদিনের সব'চে প্রিয় ও সব'চে আনন্দদায়ক কাজ ছিল। মূলতঃ কুরআনের প্রেমে তাঁর অন্তর পূর্ণ ছিল। এর প্রমাণ তাঁর এই কথায়-ই পাওয়া যায়-

"আমি (প্রথমে) আমার মায়ের পেটে কুরআন মজীদ শুনেছি। পুনরায় তাঁর কোলে শুনেছি। এর পর তাঁর কাছেই পড়েছি।" (হায়াতে নূর পৃ: ৪)

মোকাররম মুবাশ্বের আহমদ খালেদ

অনুবাদ ঃ **শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন**

(দৈনিক আল ফযল ২৪ জুন-২০০৫)

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগরের জনাব মমতাজ আহমদ মাস্টারের স্ত্রী মোছাম্মদ আরেফা বেগম রংপুর হাসপাতালে গত ৭ আগস্ট রোজ রবিবার রাত ৯.২৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)। তিনি মৌলভী আব্দুল হাকিম সাহেবের মেয়ে। মরহুমা তার ৮ কন্যা ও ১ ছেলে এবং অনেক নাতী-নাতনী রেখে গেছেন। মরহুমার রূহের মাগফেরাতের জন্য এবং তাঁর পরিবারকে আল্লাহ্‌তাআলা যেন সাবরে জামীন দান করেন, সেজন্য সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমার নাতী- মোহাম্মদ সোলায়মান

মুরব্বী সিলসিলাহ

মৃত্যুঞ্জয়ী আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী

(চতুর্থ কিস্তি)

অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ও ধর্মের সেবায় নিবেদিত মানুষ খাঁ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর অনেকগুলো পুস্তক ইংরেজী ও বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর প্রথম অনুবাদের বই 'কিস্তিহে নূহ' ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত হয়। এ যুগে আবির্ভুত হযরত নূহ (আঃ) এর রূপক কিস্তিতে আরোহনের লক্ষ্যে বাঙ্গালীদের মধ্যে সাড়া জাগানোর ক্ষেত্রে তাঁর বঙ্গানুবাদের পুস্তকটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। পরবর্তী বঙ্গানুবাদের পুস্তক 'ফতেহ ইসলাম' ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্তাআলার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইসলামের বিশ্ববিজয়ের ঐশী তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ বিবেকবান বাঙ্গালীদের অন্তঃকরণে নাড়া দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর 'পয়গামে সোলেহ' পুস্তকটিও তিনি বঙ্গানুবাদ করেছিলেন (৩০ মার্চ ১৫ এপ্রিল ১৯৬৩)। তাছাড়া তিনি অসংখ্য খুৎবা, মলফূযাত, ও বক্তৃতা ইংরেজী ও বাংলায় অনুবাদ করেন। আমেরিকার প্রথম মিশনারী হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ১৯২২ সাল হতে প্রকাশিত 'দি মুসলিম সান রাইজ' পত্রিকাটি প্রকাশনার কাজ খাঁ সাহেব অব্যাহত রাখেন। তিনি দক্ষতার সাথে এর সম্পাদনা করেছিলেন এবং আমেরিকায় বসে রাবওয়া থেকে প্রকাশিত 'Review of Religions'এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'পাক্ষিক আহমদী' পত্রিকায় তিনি লিখতেন। তাঁর লেখনীতে পত্রিকাগুলো অনেক তথ্যপূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী, প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধশালী হয়। ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় রচিত লেখাগুলো মানব মনের খোরাককে পরিতৃপ্ত করে। একদা রমযান উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এর উপদেশাবলী তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন যা 'Review of Religions'এর মার্চ ১৯৬৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এ অমৃতবাণীগুলো ইংরেজী থেকে বাংলায় আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইল অনুবাদ করে পাক্ষিক আহমদীর ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৫ সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

পাক্ষিক আহমদীর সাথে খাঁ সাহেবের ছিল হৃদয়ের সম্পর্ক। কেননা ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশনা তিনি নিজ হাতে গড়ে তোলেন। অনেক শ্রম দিয়েছেন। তাই পত্রিকাটি নিয়মিত পাঠে এর উন্নতি কল্পে বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন। প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের রচিত 'পরকাল' সম্পর্কীয় লেখাটি পড়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। প্রশংসায় পত্রিকাটি উন্নত কাগজে মানন্নোয়নের জন্য তাঁর হৃদয়ের আকুতি ব্যক্ত করে আমীর সাহেবের নিকট পত্র লিখেন। তাঁর সেই অমূল্য পত্রটি হল ঃ

আমেরিকা
১৪ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ খ্রীঃ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করীম ওয়া আলা আবদিহিল মাসীহুল মাওউদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লাম।

My Dear Brother,

আসসালামু আলাইকুম, ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

অদ্য ৩০ অক্টোবর ১৯৬৫ সংখ্যা পাক্ষিক আহমদীতে আপনার 'পরকাল' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পড়ে বড়ই আনন্দিত ও উপকৃত হলাম। প্রবন্ধটি বড়ই সারগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ। আত্মা ও পরকাল সম্বন্ধীয় জটিল বিষয়টিকে আধুনিক আবিষ্কৃত তথ্যাদি দ্বারা যেরূপ পরিষ্কারভাবে বোধগম্য করেছেন তা বাস্তবিকই অতি প্রশংসনীয়। পাঠকগণ মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে তা দ্বারা বড়ই উপকৃত হবে। আমি স্বয়ং খুবই উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ্তাআলা আপনাকে জাযায়ে খায়ের দিন, আমীন। প্রবন্ধটি যদি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে পুস্তক আকারে ছাপাতে পারতেন তবে বড়ই ভাল হত। আমার বিশ্বাস অনেক বড় বৈজ্ঞানিক ও নাস্তিক ভাবাপন্ন লোক এটা পাঠ করে ঈমান লাভ করবে। আল্লাহ্তাআলা আপনার সহায় হউন।

আহমদী পত্রিকা আজকাল খোদাতাআলার ফযলে প্রবন্ধাদির দিক দিয়ে বড়ই উন্নতি করেছে। কিন্তু এর কাগজ বড়ই খারাপ। এরূপ ভাল ভাল সারগর্ভ প্রবন্ধাদি এরূপ কাগজে ছাপানো আমার মতে শোভা পায় না। ভাল জিনিস ভাল পাত্রে পেশ করলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বাংলার আহমদীরা কি মাসিক দশ বিশ টাকা খরচ করে তাদের মুখপত্রকে একটু সুন্দররূপে পেশ করতে পারে না? আমার ধারণা বর্তমানে বাংলায় এমন অনেক আহমদী আছেন যারা ইচ্ছা করলে একাই এর কাগজের সমস্ত মূল্য দান করতে পারেন। আল্লাহ্তাআলা আমাদের ভাইদের দিল খুলে দিন। আমীন।

ওয়াসসালাম
খাকসার
আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী
(পাক্ষিক আহমদী ১৫ ও ৩০ মার্চ ১৯৬৬)

উল্লেখ্য, বর্তমানকালে পত্রিকাটির কাগজ ও ছাপার মান অনেক উন্নত হয়েছে। তাঁর মনের বাসনা অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছে। হায়! এ বুযুর্গ যদি বর্তমানে জীবিত থাকতেন তাহলে এটা প্রত্যক্ষ করে হয়তো তিনি বড়ই আনন্দিত হতেন।

দারুল খেলাফত এবং স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি আব্দুর রহমান সাহেবের ছিল নাড়ির সম্পর্ক। ওয়াক্তের খলীফাগণের প্রতি তাঁর ছিল একনিষ্ঠ আনুগত্য ও গভীর ভক্তি পূর্ণ শ্রদ্ধা। স্বদেশের বাঙ্গালী আহমদীদের সাথে তাঁর ছিল প্রাণের আবেগপূর্ণ ভালবাসা ও দোয়া। নিজেকে তিনি বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। তাই নিজের নামের সাথে সর্বদা বাঙ্গালী শব্দটি লিখতেন। চল্লিশ দশকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর ঢাকায় শুভাগমনের প্রত্যাশায় ঢাকার বক্সীবাজারস্থ দারুত তবলীগে একটি নতুন ঘর তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে দারুত তবলীগ আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত বিভক্ত হয়।

কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার মনোনীত খলীফা ঐশী নেতার বাংলার মাটিতে পদার্পণে বাঙ্গালীদের সৌভাগ্য হয়নি। তাই ১৯৬৫ সালে হুযূর (রাঃ) ওফাতের পর আব্দুর রহমান সাহেব অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে হৃদয়ের আকুতি ব্যক্ত করে ঢাকার আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইলকে লিখিত একটি পত্রে বলেন, হায়! আমাদের প্রিয়তম নেতা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) আজ ইহজগত হতে অর্ন্তধান হয়ে গেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি বাংলায় যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বাংলার আহমদীরা তাঁকে আপন দেশে আনবার বন্দোবস্ত করতে পারল না। তাই বঙ্গভূমি এ মহাপুরুষের পবিত্র পদধূলির স্পর্শ হতে এবং বাংলার আহমদীরা তাঁকে আপন দেশে নেয়ার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত রইল। এটা বাস্তবিকই বড়ই হৃদয় বিদারক। যাহোক, এটার এক কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত রয়েছে। তা এই যে, বাংলার আহমদীরা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর প্রবর্তিত ইসলামের সেবার প্রোগ্রামকে কেবল বাংলায় নয় বরং বহিঃদেশে যেন সফলকাম করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং জানমাল তজ্জন্য উৎসর্গ করেন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের বাংলার ভাইবোনদের এই কাফ্ ফারা পেশ করার তৌফীক দিন, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন এবং ইসলামের খেদমত ও তজ্জন্য প্রয়োজনীয় কুরবানী দ্বারা এর প্রায়শ্চিত্ত করার তৌফীক আমাদেরকে দিন। আমাদের ইসলামের সেবা এবং ইসলামের জন্য ত্যাগ দেখে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর রূহ স্বর্গে আনন্দিত হোক এবং বাংলার উপর আশিস বর্ষণ করুক। তাঁর দেহ বাংলায় আসতে পারল না; কিন্তু তাঁর আদর্শ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হোক।

ওয়াসালাম

খাকসার

আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী

চীফ মুসলিম মিশনারী ইনচার্জ আমেরিকা

(পাক্ষিক আহমদী ১৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬)

বলা বাহুল্য শতবর্ষের পুরাতন বাংলাদেশের আহমদীয়াত। কিন্তু আমরা দুর্ভাগা বলেই ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কিংবা তাঁর কোন খলীফার বাংলার মাটিতে পদার্পণ হয়নি। এটা আমাদের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার প্রতিফলন। কাজেই ঐশী নেতা যুগ খলীফার শুভাগমণের আশায় আমাদের দোয়া ও যোগ্যতা অপরিহার্য। আর তা হলে আব্দুর রহমান খাঁ সাহেবের পুণ্য আত্মাও হয়তো তৃপ্ত হবে।

ত্রিত্ববাদীদেরকে একত্ববাদে রূপান্তরে দক্ষ মানুষ খাঁ সাহেব ১৯৬৭ সালে ডিসেম্বরে রাবওয়ার সালানা জলসার প্রাক্কালে স্বদেশে আসেন। তখন আমেরিকার বুকে তাঁর কর্মতৎপরতার কথা শুনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) মুগ্ধ হন এবং হযরত ঈসা মসীহের বিপথগামী মানুষকে আরো অধিক পরিমাণে মসীহিজ্জামানের শান্তির নীড়ে আহ্বানের বিভিন্ন পদ্ধতির দিক নির্দেশনা দেন। তাঁর স্বজনরা তাঁকে কাছে পেয়ে অভিভূত হয়ে যায়। তখন কাজের পাগল মানুষ খাঁ সাহেব 'Review of Religions' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে জড়িত হন। তিনি সহকারী সম্পাদনার কাজ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি জন্মভূমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছুটে আসেন। ঢাকা থেকে ট্রেন যোগে যখন ব্রাহ্মনবাড়িয়া রেল ষ্টেশনে পর্দাপণ করেন তখন তাঁকে প্রাণ ঢালা অভ্যর্থনা জানাতে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টসহ একটি বিরাট কাফেলা উপস্থিত ছিল। সেদিন এ কাফেলায় আমারও উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়।

শ্যাম বর্ণের হালকা পাতলা গড়ন শ্মশ্রু মন্ডিত হাস্যজ্জোল নূরানী চেহারার তুর্কী লাল টুপি পরিহিত লোকটি ট্রেন থেকে নামার পর ফুলের মালা পড়িয়ে বরণ করে নেয়া হয়। অপেক্ষমান সকলে হৃদয়ের উচ্ছাসে তাঁর সাথে আলিঙ্গন করেন। যেন আমেরিকা বিজয়ী একবীর সেনানী মাতৃকোলে ফিরে এসেছেন। তিনি নিজ আত্মীয় স্বজন ও প্রাক্তন সুহৃদ বন্ধুদেরকে কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে যান। মিষ্টভাষী লোকটি সবার সাথে প্রাণ খুলে কথা বলেন। অদূরে নিজ বাড়ি পুনিয়াউট গিয়ে পৌছলে তাঁর সহোদর ভাই বজলুর রহমান খাঁ ও আলী আজম খাঁ সাহেব তাঁকে রক্তের টানে বুকে জড়িয়ে ধরেন। খাঁ বাড়ীর স্বজনর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হন। তাঁর হারানো স্মৃতি হৃদয় পঠে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে স্থানীয় বার লাইব্রেরীতে তাঁর সম্বর্ধনায় জাকজমক পূর্ণ এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। এর প্রধান আয়োজক ছিলেন তাঁর বাল্য বন্ধু এককালের সহপাঠী ও সহকর্মী এডভোকেট গোলাম ছামদানী খাদেম। এতে শহরের অনেক শিক্ষিত গুণীজন উপস্থিত ছিলেন। আহমদী বক্তারা প্রাণের আবেগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃতী সন্তান বাঙ্গালী আহমদীদের গর্বের ধন অতিথির বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্যের অনবধ্য স্বার্থকতা অলংকন করেন। এক অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয়। খাঁ সাহেব এতে বিমুগ্ধ হয়ে যান। তিনি আমেরিকায় জামাতে আহমদীয়া কর্তৃক ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ব্যাপকতা তোলে ধরেন। এতে শ্রোতারা সকলেই মুগ্ধ হন। আহমদীদের মাঝে আহমদীয়াতের বিশ্ববিজয়ের রূপরেখা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। তাছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবনির্মিত মসজিদে মোবারকে খাঁ সাহেবের সম্মানে এক প্রাণবন্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সমবেত আহমদীদের মাঝে অতীতের স্মৃতিচারণসহ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের ক্রমবর্ধমান ধারা আলোকপাত করেন। অতঃপর খাঁ সাহেব তারুয়া যান। তারুয়া জামাতে আহমদীয়ার উদ্যোগে তাঁর সম্মানে এক উৎসব মূখর আনন্দঘণ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হয়। আহমদী ও অ-আহমদী প্রচুর লোকের সমাগমে তিনি বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য খাঁ সাহেব বয়াত গ্রহণের কয়েক বছর পূর্বে তারুয়ায় বিয়ে করেছিলেন। তাঁর প্রথম ছেলে মাওলানা সালাউদ্দিন খাঁ মাতুলালয় তারুয়ায়। তাই তারুয়া গ্রামের সাথে তাঁর ছিল নীবিড় সম্পর্ক। পরিশেষে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার বিভিন্ন জামাত সফর ও আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করে ঢাকা চলে আসেন। তখন ঢাকার দারুত তবলীগে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে এক প্রাণবন্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন অনুষ্ঠান হয়। জামাতে আহমদীয়ার বিশিষ্ট বুযূর্গ ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন। *(চলবে)*

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

মুলাকাৎ

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'(রাহেঃ)-এর সাথে বাঙ্গালীদের মুলাকাৎ অনুষ্ঠান, তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০০০]

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব পবিত্র কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেন।

১। প্রথম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্তাআলা জানতেন যে, রসূলে করীম (সঃ) পড়তে জানতেন না তা সত্ত্বেও প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় "ইকরা" অর্থাৎ পড় এটার তাৎপর্য কী?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ প্রশ্নকারী মনে হয় জানেন না যে, আরবী শব্দ "ইক্রা" এর দু'টি অর্থ আছে। একটি অর্থ পড়া, আর একটি অর্থ তিলাওয়াত করা অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি করা।

হুযূর পাক (সঃ) ভেবেছিলেন হযরত জিব্রাইল তাঁকে পড়তে বলছেন, এজন্য রসূলে পাক (সঃ) বলেছিলেন, "মা আনা বে কারেইন" অর্থাৎ আমি তো পড়তে জানি না। পরে হুযূর পাক (সঃ) বুঝলেন যে, তাঁকে শুধু পুনরাবৃত্তি করতে বলা হচ্ছে তখন হুযূর পাক (সঃ) হযরত জিব্রাইলের সাথে সাথে পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করলেন।

২। দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আমরা পশ্চিমাদেশে আমাদের ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারি। অথচ আমাদের নিজেদের দেশসমূহে এক দল আর এক দলের ধর্মপালনে বাধা সৃষ্টি করে। এই সমস্যার সমাধান কী?

হুযূর বলেন ঃ আমি নিকট ভবিষ্যতে এই সমস্যার কোন সমাধান দেখি না। মুসলমানের প্রতি মুসলমানের যে বিদ্বেষ আর হিংসা তা ক্রমশঃ বাড়ছে, কমছে না। আর অমুসলমানদেরকেও তারা ঘৃণা করে কিন্তু অমুসলিমদের কার্যকলাপের প্রতি তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। তাদেরকে ইচ্ছামত চলার অনুমতি দেয়া আছে। মুসলমানদের প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ ভয়ানক রূপ নিচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের ভুল বোঝার শক্তি ও ক্ষমতা না দিবেন আমি (হুযূর) এর কোন সমাধান দেখি না। তারা খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহ্ না করুন যদি এই ধরা পৃষ্ঠ থেকে আহমদীয়ত বা জামাতে আহমদীয়া বিলুপ্ত হয়ে যায় বা মিটে যায় তো এই মোল্লারা শাসকের আসনে বসলে দুনিয়াকে ধ্বংস করে ছাড়বে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ্তাআলা এটা কোন দিনই ঘটতে দিবেন না। তাই চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, আহমদীয়ত ইন্শাআল্লাহ্ অবশ্যই জয়যুক্ত হবে আর এই মোল্লারা ধ্বংস হবে।

৩। তৃতীয় প্রশ্ন ঃ কথিত আছে কেয়ামতের ত্রিশ কি চল্লিশ দিন পূর্বে ইমাম মাহ্দী আসবেন, তিনি যুদ্ধ করে অমুসলমানদেরকে মুসলমান বানাবেন তারপর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। হুযূর কী বলেন?

হুযূর বলেনঃ আপনি যে কথাগুলো শুনেছেন সব ভুল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাদীস থেকে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা হচ্ছে অন্য রকম। তাছাড়া চিন্তা করুন যে, ইমাম মাহ্দী যদি কেয়ামত থেকে মাত্র ত্রিশ, চল্লিশ দিন পূর্বে আসেন তো তাঁর কার্যকলাপের গুরুত্বই বা কী থাকবে ?

৪। চতুর্থ প্রশ্ন ঃ পবিত্র কুরআন শরীফে কোথাও উল্লেখ নেই যে, প্রত্যহ পাঁচ বার নামায পড়তে হবে। হুযূর কী বলেন?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ পবিত্র কুরআনে একটি আয়াত আছে 'আকিমিস্ সালাতা.... "সেই আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ পাওয়া যায়। আর একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, পবিত্র কুরআন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তিনি এ পবিত্র গ্রন্থকে ভাল করে বুঝে ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ এর চেয়ে "পারভেজী" সম্প্রদায়ের লোকেরা কি পবিত্র কুরআনের মর্মবাণীকে বেশি বোঝেন? কারণ এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, "পারভেজী"রা বলে থাকেন, দিনে পাঁচবার নামায পড়ার প্রয়োজন নেই। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন এবং তাঁর সুন্নতের অনুসারী (পারভেজীরা বাদে) দুনিয়ার তাবৎ মুসলমান দৈনিক পাঁচবার নামায পড়েন।

৫। পঞ্চম প্রশ্ন ঃ ইতিহাসে লেখা আছে হযরত শাহ্জালাল (রাহঃ) বাংলাদেশের সিলেটে এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর কি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে কোন আত্মিক সম্পর্ক ছিল?

হুযূর বলেনঃ নিশ্চয়ই ছিল । ঐ রকম আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক না থাকলে তিনি সফলভাবে ইসলাম প্রচার করতে পারতেন না।

৬। ষষ্ঠ প্রশ্নঃ ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভাব পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। হুযূর এই প্রভাব সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করুন।

হুযূর বলেন ঃ হ্যাঁ তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। তারা বর্তমানে রাশিয়াতেও এই কাজ করছে, যদিও রাশিয়া এই প্রভাব প্রতিহত করার চেষ্টা করছে কিন্তু সে-ও এই প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

৭। সপ্তম প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে আঁ হযরত (সঃ)-এর মি'রাজ শারীরিকভাবে হয়েছিল, এই ধারণাটা ব্রেরেলভি ধারার মুসলমানদের। এমন লোকদের কী উত্তর দেয়া যেতে পারে?

হুযূর বলেন ঃ ব্রেরেলভি মতবাদে একটা স্ববিরোধিতা আছে। একদিকে তারা দাবি করেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর শরীরই ছিল না। তিনি নূর (আলো বা জ্যোতিঃ) ছিলেন। আবার তারাই বলেন, তিনি যখন মি'রাজ-এ গেলেন তখন রক্ত মাংসের শরীর নিয়েই আকাশে গিয়েছিলেন। এখন চিন্তা করুন যার কোন শরীর ছিল না তাঁর আবার শারীরিকভাবে মি'রাজ কি করে হতে পারে? আরও একটি কথা হচ্ছে, যে হাদীসে আঁ হযরত (সঃ) মি'রাজের রাতে কা'বা শরীফের নিকট 'হাতীম' নামক স্থানে ঘুমাচ্ছিলেন এবং যখন মি'রাজ শেষ হ'ল তখন তাঁর ঘুম ভাংলো। আরবীতে বলা হয়েছেঃ "সুম্মাস তায়কাজা"। যার অর্থ হচ্ছে তিনি জেগে গেলেন। এটা বলা হয় নি যে, তখন তিনি ফিরে এলেন। আরও একটা কথা হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তো সব সময়ই আল্লাহ্তাআলার সান্নিধ্যে ছিলেন। তাঁর শারীরিকভাবে আল্লাহ্র সাথে দেখা করার জন্য আকাশে যাওয়ার দরকার কি ছিল? আরও বলা হয় আকাশে একটা কুল বৃক্ষ ছিল। চিন্তা করুন সেই কুল বৃক্ষটাই বা আকাশে কি করেছিল? আসল কথা হচ্ছে মি'রাজ একটি আধ্যাত্মিক ঘটনা এবং কুল বৃক্ষ ইত্যাদি সবই প্রতীকীরূপে ছিল।

৮। অষ্টম প্রশ্ন ঃ হযরত রসূলে করীম (সঃ) একেবারে সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই "খাতামান্নবীঈন" ছিলেন তবে তাঁকে অন্যান্য নবীগণের পরে পৃথিবীতে পাঠানো হ'ল কেন?

হুযূর উত্তরে বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) Potentially সবারই পূর্বে "খাতামান্নাবীঈন" ছিলেন। তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর নিজের জন্মের পূর্বেও একবার তিনি দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন। আসল অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) "খাতামান্নাবীঈন" ছিলেন আল্লাহ্র মনে পরিকল্পনায়, তাঁর নীল নক্শাতে। বাস্তবে তিনি অন্য সব নবীর পরে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং শেষ শরীয়ত বহন করেন যখন "শরীয়ত" চূড়ান্ত

রূপ ধারণ বা অর্জন করে। এটাই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার ছিল যে, যখন "শরীয়ত" চূড়ান্তরূপ ধারণ করবে তখনই "খাতামান্নাবীঈন" আসবেন।

৯। নবম প্রশ্ন ঃ ইসলামী আইনে একজন পুরুষ চারটি মহিলাকে বিয়ে করতে পারে তো একটি মহিলা চারজন পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না কেন?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ আমি আগেও এই প্রশ্নের বহুবার উত্তর দিয়েছি। যদি প্রত্যেক পুরুষ চারটি মহিলাকে বিয়ে করে এবং প্রত্যেকটি মহিলা চারটি পুরুষকে বিয়ে করে তো চিন্তা করুন পরিবারগুলোর ও বাচ্চাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে? সন্তান-সন্ততিদের দায়িত্ব কে নিবে? এটাই বা কি করে নির্ণয় করা যাবে যে, কোন শিশু আইনতঃ কোন পিতার ' এই প্রশ্নটা একেবারেই অর্থহীন।

১০। দশম প্রশ্ন ঃ নামাযে সিজ্‌দা করার সময় আমাদের নাক এবং হাত কীভাবে রাখা উচিত?

হুযূর বলেন ঃ সিজ্‌দার সময় আমাদের দু'কনুই যেন মাটি স্পর্শ না করে আর আমাদের নাক যেন অবশ্যই মাটি স্পর্শ করে।

১১। একাদশ প্রশ্ন ঃ যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তারা আরও ভাল মুসলমান কীভাবে হতে পারে?

হুযূর বলেন ঃ নামাযের মাধ্যমে নামাযীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান অবশ্যই উন্নত হয়। যারা নামায ছেড়ে দেয় তারা বুঝতে পারে তাদের ঐ মান নিম্নগামী হয়। নামাযের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঐসব উন্নতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি নামায না পড়ার পূর্বে কোন খারাপ কাজ করতো এবং নামায পড়ার পরেও আবার সে রকম মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যায় তো নামায পড়ে তার কোনই লাভ হ'ল না। ইবাদত অর্থাৎ উপাসনার পরে কোন চারিত্রিক উন্নতি হচ্ছে কিনা এ দিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য।

১২। দ্বাদশ প্রশ্ন ঃ মদ পান করার লাভ ও ক্ষতি কি?

হুযূর বলেন ঃ মদ পান করার ক্ষতি তো প্রায় সবাই জানে। মদ পানের সুফল দেখা যায় যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ কারও যদি "নিউমোনিয়া" রোগ হয় তখন তাকে সঙ্গে সঙ্গে "ব্রান্ডি" পান করান হয়। এতে ভাল ফল পাওয়া যায়। ঔষধ আকারে কোন কোন সময় এ রকম মদপানে সুফলও লাভ হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, মদপানে কুফল ও সুফল আছে কিন্তু এর কুফল সুফলের চাইতে পরিমাণে অনেক বেশি।

ত্রয়োদশ প্রশ্ন ঃ মানুষের জন্ম সবচে' প্রথম কীভাবে ঘটে?

হুযূর বলেন ঃ প্রশ্নকারীর বয়স এত কম যে, এই জটিল প্রশ্নের উত্তর তাকে বোধগম্য করানো কঠিন মনে হচ্ছে। মানুষের জন্ম বৃত্তান্ত বুঝতে হলে বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে বলতে হয়। যা ছোটরা সহজে বুঝতে পারে। প্রথমে এই পৃথিবীতে কোন কিছুই ছিল না শুধু আগুন ছিল। চিন্তা করুণ এই পৃথিবীতে প্রাণীরা জন্ম নিল কী করে? প্রাণীদেরকে কে সৃষ্টি করেছিলেন? প্রাণ আল্লাহ্‌তাআলা সৃষ্টি করেছিলেন।

১৪। চতুর্দশ প্রশ্ন ঃ শিয়া, সুন্নী ও আহমদীদের মধ্যে পার্থক্য কী?

হুযূর বলেন ঃ শিয়ারা বলেন, প্রথম যুগে ইসলামের যে তিন খলীফা হয়েছিলেন তাঁরা অবৈধভাবে খলীফা হয়েছিলেন। তারা মু'মিনগণের খলীফা ছিলেন না, তাঁরা কপট লোকের খলীফা ছিলেন। শিয়াদের ঐসব ধারণা বা বিশ্বাস অদ্ভুত ধরনের। শিয়ারা বলে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিব্রাঈল ফিরিশ্‌তা ভুল করে 'নবুওয়তের' বাণী দিয়েছিলেন। আসলে হযরত আলী (রাঃ)-কে ঐ বাণী দেয়ার কথা ছিল। এখন বলুন, আপনারা কি এসব ব্যাপারে কল্পনা করতে পারেন? শিয়ারা এসব বিষয়ে কোন যুক্তি-তর্ক মানতে রাজি নয়। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বলা হয়। কিন্তু শিয়ারা বলেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পরে মাত্র দশ (১০) জন অনুসারী সত্যিকার অর্থে মু'মিন ছিলেন বাকীরা সবাই মুনাফিক (কপট) ছিলেন। এখন বলেন 'রাহমাতুল্লিল্ আলামীন' এর অর্থ কী দাঁড়ালো? রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্বের নবীগণের পর তো অনেক বেশি সংখ্যায় মু'মিন অনুসারী ছিলেন।

আবার সুন্নীদেরও অনেক ধর্ম-বিশ্বাস আমাদের অর্থাৎ আহমদীগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ ব্রেল্‌ভীদের কথা আমি এই অধিবেশনেই একটু আগে বলেছি। তারা বিশ্বাস করেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) 'আলেমুল গায়ব' ছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলার মতই ভবিষ্যতের অনেক ঘটমান বিষয়ে জানতেন। এসব কথা একেবারে ভুল। শুধু আল্লাহ্‌তাআলা 'আলেমুল গায়ব' এবং তিনি যতটুকু রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জানাতেন ততটুকুই আঁ হযরত (সঃ) জানতেন।

আবার সুন্নীদের মধ্যে ওয়াহাবী'রা খুব জোর দিয়ে বলে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) একেবারে সাধারণ মানুষ ছিলেন। তার জ্ঞান তো শয়তানের জ্ঞানের চেয়েও কম ছিল। এসব ধারণা একবারে হাস্যকর।

এজন্যই আমরা বলি, এই যুগে আহমদীয়ত হচ্ছে আসল ইসলাম!

১৫। পঞ্চদশ প্রশ্ন ঃ মধ্য প্রাচ্যে যে শান্তি আলোচনা চলছে ইসরাঈলীদের ও প্যালেষ্টাইনবাসীদের মধ্যে-তার সম্পর্কে হুযূরের মতামত কী?

হুযূর উত্তরে বলেনঃ আমার মনে হয় না নিকট ভবিষ্যতে কোন বড় রকম অগ্রগতি হবে। ইহুদীরা জেরুযালেমের মসজিদ আক্‌সা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীরা ভীষণ কষ্টে আছে এবং বড় কুরবানী করে যাচ্ছে। ইহুদীরা দুনিয়াতে সব চাইতে খারাপ জাতি। তাই তো পবিত্র কুরআনে তাদেরকে আখ্যা দেয়া হয়েছে' মাগযুবি আলায়হিম'। তাদের উপর আল্লাহ্ ক্রোধ বর্ষণ করবেন এবং মানবকুল তাহাদেরকে অভিশাপ দিবে। আপনারা আমাকে নৈরাশ্যবাদী বলতে পারেন কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়া-এতে আমি কোন আশার আলো দেখি না। ইহুদীরা দু'ধরনের। এক রকম ইহুদী ছিলো হযরত মূসা (আঃ)-এর সত্যিকার অনুসারী। তারা ভাল লোক ছিল। আর এক রকম ইহুদী হচ্ছে যাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তারা শেষ যুগে অবস্থান করবে। আমার ধারণা এখন আমরা শেষ যুগের ইহুদীগণকে দেখছি। এই কারণে আমি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির আপাততঃ কোন লক্ষণ দেখি না।

ষষ্ঠদশ প্রশ্ন ঃ কোন মুসলমান নিজের ঘরে ছবি রাখতে পারে কিনা। আর রাখলে সেই ঘরে নামায হবে কিনা?

হুযূর বলেন ঃ হ্যাঁ ছবি রাখা যায় এবং সেই ঘরে নামাযও পড়া যাবে কিন্তু ছবিটা নামাযের একেবারে সামনা-সামনি জায়গায় না রাখলেই হ'ল। কারণ ছবি সামনে থাকলে মনোযোগ নষ্ট হতে পারে।

১৭। সপ্তদশ প্রশ্ন ঃ আমরা নিজেকে দেখতে পারি না কেন? হুযূর প্রশ্নকারী বালিকাকে বলেন তুমি আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে অবশ্যই দেখতে পারবে।

সংকলন ও অনুবাদ ঃ আলহাজ্জ নূরুদ্দীন, আমজাদ খান চৌধুরী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র

(মকত্বাতে আহ্মদীয়া, ৫ম খন্ড)

সংকলক– হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ) এর নামে

পত্র নং- ১

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করীম।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) হবার দাবী

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! এই অধম (বারাহীনে আহ্মদীয়ার প্রণেতা) আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে, যাতে বনী ইস্রাঈলী নবী (হযরত) মসীহ্র আকারে, অবস্থায় ও পদ্ধতিতে পরম বিনয় ও দীনতা, গরীবি, অমায়িকতা ও আত্মবিলীনতা দিয়ে জনমানবের সংস্কার-সংশোধন সাধনের জন্য চেষ্টা করে এবং প্রকৃত সত্য পথ অজানা লোকদেরকে সিরাতে-মুস্তাকীম দেখায় যে পথে চলায় প্রকৃত নাজাত (পরিত্রাণ) লাভ হয় এবং ইহকালেই বেহেশ্তি জীবনের আভাস ও লক্ষণাবলী, কবুলিয়ত ও মাহ্বুবীয়তের (ঐশী প্রেম লাভের) নূর পরিলক্ষিত হয়।

বিনীত

গোলাম আহমদ, ৮ই মার্চ ১৮৮৫ইং।

মন্তব্য ঃ হযরত হাকীমুল-উম্মত (খলীফা আওওয়াল মাওলানা নূরুদ্দিন (রাঃ)-এর নামে এই প্রথম পত্রটি আমার হস্তগত হয়েছে। এতে অনুমিত হয়, এর পূর্বেরও কয়েকটি পত্র থাকতে পারে। এ পত্রটিরও আসল পান্ডুলিপি অর্থাৎ মূল পত্রটি আমি পাই নি। বরং হযরত হাকীমুল উম্মতের নোটবই থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং ৩১ আগষ্ট, ১৯০৭ইং তারিখের 'আল-হাকাম' পত্রিকায় আমি তা প্রকাশ করেছিলাম। এ পত্রটির অধ্যয়নে জানা যায় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মসীহ্ নাসেরীর পদমর্যাদায় প্রেরিত ও প্রত্যাদিষ্ট হবার দাবী মার্চ, ১৮৮৫ সালে করেছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রতি সুস্পষ্ট ঐশী আদেশ অবতীর্ণ হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বয়আতের ঘোষণা করেন নি। (ইয়াকুব আলী ইরফানী)

পত্র নং-২

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম
নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করীম

'আস্সামাদ' (সর্বনির্ভরস্থল) আল্লাহ্তে আশ্রয়ী বিনীত গোলাম আহ্মদের পক্ষ থেকে, সম্মানিত ও ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)-এর সমীপে ঃ

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার মর্মস্পর্শী পত্রটি পেলাম। জনাবের কলিজার টুকরো দু'জন পুত্রের মৃত্যু ও তৃতীয় পুত্রের অসুস্থতার অবস্থা জেনে মর্মাহত হয়েছি। আল্লাহ্জাল্লাশানুহু চোখ জুড়ানো তৃতীয় পুত্রকে আরোগ্য করুন। ইন্শাআল্লাহ্লআযীয এই অধম আপনার পুত্রের জন্য দোয়া করবে। আল্লাহ্তাআলা আমাকে নিজ কৃপায় ও অনুগ্রহে এমন দোয়ার তওফীক দান করুন, যা এর যাবতীয় শর্তের ধারক ও বাহক হয়। এ বিষয়টি কোন মানুষের নিজ ইখতিয়ারভুক্ত নয়। এটি কেবল আল্লাহ্তাআলারই আয়ত্তে। তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আপনি যদি গোপনীয়ভাবে নিজ প্রিয় পুত্রের আরোগ্যলাভে, মনে মনে কিছু মানত (নযর) নির্ধারণ করে রাখেন তা'হলে বিস্ময়কর নয় যে সে গুণগ্রাহী খোদা যিনি নিজ সত্তায় স্বয়ং করীম (মহানুভব) ও রহীম (অতি কৃপালু), তিনি আপনার ঐ আন্তরিক নিষ্ঠাকে কবুল করে আপনাকে দুঃখ-বেদনার এ কবল থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। তিনি তাঁর নিষ্ঠাপরায়ণ বান্দাদের প্রতি তাদের পিতা-মাতার চেয়েও বেশি দয়া করে থাকেন। তিনি মানত ইত্যাদির আদৌ মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু অনেক সময় মানুষের আন্তরিক নিষ্ঠা উক্ত পথেই সাব্যস্ত ও সত্য প্রতিপন্ন হয়। ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), হৃদয়বিগলিত ক্রন্দন ও তওবা (অনুসূচনা) অতি উত্তম জিনিস- এতদ্ব্যতিরেকে সব মানতই তুচ্ছ ও নিষ্ফল

নিজ মৌলা ও প্রভুর ওপর দৃঢ় আশা রাখ এবং অতি আশিসময় তাঁর সত্তাকে সবচেয়ে বেশি প্রিয় বানাও, তিনি যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসী বান্দাদেরকে বিনষ্ট করেন না এবং তাঁর দিকে সত্যিকারভাবে প্রণত ও নিবিষ্টচিত্তদেরকে দুঃখ-বেদনার গহ্বরে ছেড়ে দেন না।

রাতের শেষাংশে ওঠো ও ওযু কর এবং ইখ্লাস ও নিষ্ঠার সাথে দু' দু' করে কয়েক রাকাআত নামায আদায় কর আর মর্ম-বেদনা ও অতি বিনয়ের সাথে এই দোয়া কর ঃ

বিপদসঙ্কুল অবস্থা থেকে উদ্ধারের দোয়া ঃ

"হে আমার মোহ্সিন (কল্যাণকারী), হে খোদা! আমি তোমার এক অযোগ্য, পাপাচারে ও উদাসীনতায় নিমগ্ন বান্দা, তুমি আমার মাঝে অন্যায়ের পর অন্যায় দেখেছ, তবুও তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করেছ। আমার গোনাহ্র পর গোনাহ্ দেখেও তুমি আমার প্রতি ইহ্সানের পর ইহ্সান (উপকার) করেছ। তুমি সর্বদাই আমার পর্দাপোশি করেছ (আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছ) এবং অসংখ্য নেয়ামতে ভূষিত করেছ। অতএব এখনও আমার ন্যায় অযোগ্য ও আপাদমস্তক পাপীর প্রতি দয়া কর এবং আমার ঔদ্ধত্য ও অকৃতজ্ঞতাকে ক্ষমা করে দাও। আর আমাকে আমার এই দুঃখ-বেদনা থেকে মুক্ত কর। তুমি ছাড়া যে আর কেউ কার্যনির্বাহক নেই। আমীন, সুম্মা আমীন।"

কিন্তু সমীচীন হবে, এ দোয়ার সময়ে প্রকৃতপক্ষেই হৃদয় যেন পূর্ণ জোশের সাথে নিজ পাপ স্বীকার করে এবং আপন প্রভু আল্লাহ্র দয়া-দক্ষিণাকে উপলব্ধি করে। কারণ কেবল মৌখিক পঠনের কোন মূল্য নেই। আন্তরিক উদ্দীপনা চাই এবং আত্মবিগলন ও কান্নাও আবশ্যক। এই দোয়া এ অধমের নিয়মিত পালনীয় কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর এটি প্রকৃতপক্ষে এ অধমের স্বাভাবিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (আফাআনহু)

২০ আগষ্ট ১৮৮৫ইং

মন্তব্য (১) ঃ এ পত্রটির ওপর হযরত খলীফা আওওয়ালের নোট রয়েছে ঃ "এ পুত্রটি সে সময় ওই রোগ থেকে আরোগ্য হয়। পরবর্তীতে অন্য রোগে ('সোয়াল দামিস সিব্ইয়ান' রোগে) আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। 'আনা লি-ফিরাকিহি লা-মাহ্যূন ওয়া আদ্উ ইলাইহি রাব্বাহু'। নূরুদ্দীন, ২ ওসোজ, ১৯৪৩ বিক্রমি সন।"

মন্তব্য (২) ঃ পত্রটিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি দোয়া লিপিবদ্ধ রয়েছে। যা তাঁর নৈমিত্তিক জীবনের অংশ বিশেষ ছিল। উল্লেখিত দোয়াটি এর ভাষ্য পাঠে তাঁর জীবনের অভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর আলোকপাত হয়। আর এটি সেই সময়ের কথা যখন তিনি দুনিয়ায় খ্যাতিমান হিসাবে পরিচিত ছিলেন না। তাঁর কোন দাবীও ছিল না। কারও বয়আত নিতেন না বরং একজন নিভৃতে বসবাসকারী ব্যক্তির ন্যায় জীবন যাপন করতেন। খোদাতাআলার প্রতি কত দৃঢ় তাঁর বিশ্বাস! দোয়ার কবুলিয়তে কত ভরসা! এবং তাঁর রাত্রিকালীন ইবাদত ইত্যাদি সাধনার প্রকৃত স্বরূপ এতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর নোটটিতে এ-ও জানা যায় যে, তাঁর সেই পুত্র সে সময় বেঁচে যায়। আর এমনটি ঘটেছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার ফলশ্রুতিতে। খোদাতাআলা সেই সময় তক্দীরকে টলিয়ে দেন। ফযল ইলাহী নামে সে পুত্রটি ছিল হযরত খলীফা আওওয়ালের (রাঃ) প্রথম স্ত্রীর থেকে।

অনুবাদ– **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**, মুরব্বী সিলসিলাহ্

জন্ডিস প্রতিরোধ করুন ও সুস্থ থাকুন

ধরুন, একজনের মুখ দিয়ে হঠাৎ করে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তাকে দ্রুত বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ব্লাড টেষ্টে ধরা পড়ে হেপাটাইটিস -বি ভাইরাসে আক্রান্ত এবং তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সে জানতে পারে যে তা লিভার সিরোসিস হয়েছে। তবুও সে সুস্থ হওয়ার স্বপ্ন দেখে। সে জানায় তার জন্ডিস শুরু হয় ৯৭-৯৮ সালের দিকে। দু'বছর আগে তার রক্তে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস ধরা পড়ে। তখন সে ততটা গুরুত্ব দেয়নি, চিকিৎসারও প্রয়োজন বোধ করে নি। মাঝে মাঝে ক্ষুধামন্দ ছাড়া তার আর তেমন কোন অসুবিধা হত না। বারডেমের চিকিৎসকরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তার ভাল হবার সম্ভাবনা নেই। তবে সে যদি শুরু থেকে বিষয়টি গুরুত্ব দিতো তাহলে তার এ অবস্থা হতো না।

শুধু তার নয় বাংলাদেশে প্রায় ০৭-১০ ভাগ মানুষ হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের বাহক এবং প্রায় ৩.৫% গর্ভবতী মা হেপাটাইটিস-বি এর বাহক হিসেবে আছেন। একাধিক সূত্র মতে, বাংলাদেশে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৩০ হাজার লোক প্রতিবছর মারা যান। অন্যান্য অনেক ভাইরাসের মতো হেপাটেট্রপিক ভাইরাসের (হেপাটাইটিস এ বি সি ডি ই এবং জি) সংক্রমণজনিত কারণে মূলতঃ জন্ডিস হয়। এই ভাইরাসগুলো আক্রমণ করে যকৃত বা লিভারকে। ফলে লিভারের কাজকর্ম ব্যাহত হয়। শিশুরা এ ভাইরাসে বেশি আক্রান্ত হয়। আর ই-ভাইরাস (একিউট হেপাটাইটিস)-এ বয়স্করা বেশি আক্রান্ত হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, জন্ডিস প্রতিরোধের জন্য গুরুত্ব দিতে হবে পানি ও খাদ্যের প্রতি। কেননা বি,সি ও ভি ব্যতীত অন্যান্য অধিকাংশ ভাইরাস পানি ও খাদ্য থেকেই সংক্রমিত হয়। স্বাস্থ্য সম্মত খাবার ও বিশুদ্ধ জীবানুমুক্ত পানি পানসহ পরিবারের ব্যবহৃত বাসন কোসন পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে জন্ডিস প্রতিরোধ করা যায়। তার মানে এই নয় যে, অতিরিক্ত পানি বা এ জাতীয় খাবার খেলে জন্ডিস ভাল হয়। জন্ডিসের রোগীদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করা উচিত। তবে যদি জন্ডিসে আক্রান্ত রোগী ক্লান্ত বোধ করে, সেক্ষেত্রে পরিমাণমত বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বারডেম হাসপাতালের পরিপাকতন্ত্র ও হেপাটোলজিষ্ট ডাক্তার মোহাম্মদ মহসিন কবির বললেন, হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হলে গ্লুকোজ, আখের রস বা অতিরিক্ত পানির প্রয়োজন নেই। এক গ্লাস পানি আর এক জগ পানির মধ্যে যদি ১ চামচ করে রঙ দেওয়া হয়, তাতে দেখা যাবে গ্লাসের পানি জগের পানির তুলনায় বেশি রঙ্গিন। এভাবেই জন্ডিস আক্রান্ত রোগী যদি বেশি পানি পান করে সেক্ষেত্রে তার শরীরের হলদেটে ভাব কমে যাবে ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় জন্ডিস সেরে গেছে। কবিরাজি চিকিৎসার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন উত্তেজক ঔষধ ব্যবহারের ফলে লিভারের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে। পাশাপাশি হেপাটাইটিস-এ ভ্যাকসিন দিয়েও সাধারণ জন্ডিস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন নিলে হেপাটাইটিস -বি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। নবজাতক শিশুদের ভাইরাস জনিত জন্ডিস প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়। তবে জীবানু সংক্রমণ বিশেষতঃ ভাইরাসজনিত যকৃত প্রদাহের ফলে যে জন্ডিস হয় তা প্রতিরোধ করার জন্য বড়দের মতো শিশুদেরও সতর্ক অবস্থায় রাখতে হবে। দূষিত খাদ্য, পানীয় গ্রহণ থেকে শিশুদের বিরত রাখতে হবে। সুঁই-সিরিঞ্জ, শিরার ইনজেশন, রক্ত ও নানাবিধ রক্তজাত উপাদান সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করলে শিশুর শরীরে জীবানু প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। গর্ভকালে শিশুদের হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য মায়েদের গর্ভধারণের আগেই এ টীকা গ্রহণ করা উচিত।

জন্ডিস থেকে লিভার সিরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ক্রনিক হেপাটাইটিস-বি বা 'সি' থাকলে দীর্ঘমেয়াদী সংক্রমণের জন্য লিভারের কাজকর্ম ক্রমাগত ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সিরোসিসের প্রাথমিক উপসর্গ হলো লাগাতার ভগ্নস্বাস্থ্য, গা ম্যাজ ম্যাজে ভাব, পা-পেটে পানি আসা, অল্প অল্প জ্বর হওয়া।

পরিসংখ্যানের হিসাবে নগণ্য হলেও এই দু'টি ভাইরাসের সংক্রমণের জন্য লিভার ক্যান্সারেরও সম্ভাবনা থাকে। তবে বি-ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর ৯৫-৯৯% এর কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। ১-৫% রোগীর লিভার সিরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার ১-৫% রোগীর মধ্যে ২% এর সিরোসিস থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভাইরাস হেপাটাইটিসের প্রথম ও প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে বিশ্রাম। ৭০-৮০% রোগী ভাইরাস হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হলেও ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেন। অনেকেই জানেন না যে, হেপাটেট্রপিক ভাইরাস-বি এবং 'সি' সাধারণত মানুষের শরীরে দীর্ঘদিন ধরে থেকে যেতে পারে। অথচ সব সময় তারা রোগাক্রান্ত নাও হতে পারে। হেপাটাইটিস 'বি'-র ভাইরাস যদি শরীরে ৬মাসেরও বেশি সময় ধরে থেকে যায়, তাহলে বলা যায় সেই মানুষটি হেপাটাইটিস 'বি'-র ক্যারিয়ার। যে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদেরই এ রোগের ক্যারিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেমন-ভাইরাস লিভারকে আক্রমণ করার পর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। তবে ৯০% মানুষেরই নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাইরাস প্রতিরোধে সক্ষম হয়। মাত্র ৫% মানুষ আজীবন ক্যারিয়ার হয়ে বেঁচে থাকে।

'বি'-র চেয়েও ভয়ঙ্কর হলো হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাস। হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস না থাকলে 'সি' ভাইরাস সংক্রামিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। প্রায় ৯০% ক্ষেত্রে সি-ভাইরাস লিভার রক্তের জন্য ক্ষতিকর। সারা বিশ্বের ১৭৫ মিলিয়ন মানুষ হেপাটাইটিস 'সি'-র ক্যারিয়ার। আর পৃথিবীর ৩৫০ মিলিয়ন মানুষ হেপাটাইটিস 'বি'-র ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ার কি-না ইহার সনাক্ত করতে হলে ভাইরাস এন্টিবডি টেষ্ট এবং হেপাটাইটিস 'বি' সারফেস এন্টিজেন পরীক্ষা করা জরুরী। এই টেষ্টগুলো বর্তমানে অনেক কম মূল্যেই করা যায়। হেপাটাইটিস 'বি' প্রতিরোধে প্রত্যেক শিশুকে টিকা দেওয়া উচিৎ। যদিও হেপাটাইটিস 'সি'-র কোন প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি।

❖ হেপাটাইটিস 'বি' এবং 'সি' একজন থেকে অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করে বডি ফ্লুইড, যেমন- রক্ত, লালা, বীর্য, যোনীরস ইত্যাদির মাধ্যমে।

❖ হেপাটাইটিসের মারাত্মক দিক হলো হেপাটিক কোমা। বিশেষ করে যাদের আগে কোন লিভারের অসুখ করেছিল, যে সব বাচ্চা অপুষ্টিতে ভূগছে এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম তাদেরই হেপাটিক কোমায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। হেপাটাইটিস ভাইরাসের বিরুদ্ধে যেটুকু প্রয়োজন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই না থাকলে তাদের লিভার বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। লিভারের কোষ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ফলে শরীরে দূষিত পদার্থ জমে গিয়ে মস্তিষ্কের কোষ ডেমেজ হয়। শুধু 'বি' বা 'সি'-ই নয়, হেপাটাইটিস 'এ' বা 'ই' হলেও ফালমিনেন্ট হেপাটিক ফেইলুর হয়ে রোগীর অবস্থা অবনতি হতে পারে। তৎক্ষণাৎ রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

রোগীর প্রাথমিক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ও লক্ষণানুযায়ী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে আপনি সুস্থ হয়ে হেপাটাইটিসের টীকা গ্রহণ করতে পারেন। হেপাটাইটিস রোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে আমরা সহজেই রোগটি থেকে নিরাপদ থাকতে পারি। হেপাটাইটিসে একবার আক্রান্ত হলে তার জন্য অনেক বড় ধরনের আর্থিক মূল্য তো বটেই এমনকি মৃত্যুর মতো ভয়াবহ মূল্যও দিতে হয়। সুতরাং সুস্থ জীবন যাপন ভ্যাকসিন চিকিৎসা, এসবের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ডাঃ পারভীন হাকিম আনোয়ার, মিরপুর

দেশীয় ফলের ওষধিগুণ

আমাদের জন্মভূমি এ বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও এদেশে মাটিতে বিভিন্ন ফলের বাহার রয়েছে। দেশে ভিন্ন ভিন্ন মৌসুমে কম করে হলেও ৬০-৭০ প্রকারের ফল জন্মে। যেমন-আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, জাম, নারিকেল, কুল, কমলা, বেল, আমড়া, জামরুল, লেবু, আমলকি, সফেদা, আতা, শরিফা, ডালিম, জাম্বুরা, ডুমুর, লটকন, চালতা, বেল, কদবেল, কামরাঙ্গা, জলপাই, ঢেওয়া , তেঁতুল, তাল খেজুর, পেঁপে, কলা, কাচকলা, আনারস, তৈকর, সাতকরা, গাব, করমচা, বিলাতিগাব, অরবরই, খুদিজাম, গোলাপজাম, জগডুমুর, আঁশফল, কাউ, পানিফল ইত্যাদি। এসব ফলের প্রায় ৮০ ভাগ ফলই বৈশাখ-শ্রাবন মাসের মধ্যে ফলে। তাই বছরের এই ৪মাস এত ফল পাওয়া যায় যে, তা আর খেয়ে শেষ করা যায় না। ফলেই ফলের বেশ অপচয় হয়। দেশে ফল সংরক্ষণের তেমন কোন আধুনিক প্রযুক্তি ও আধার নেই যাতে করে এসব ফল উৎপাদনের সময় সংরক্ষণ করে রেখে ভবিষ্যতে খাওয়া যায়।

চিকিৎসকের মতে প্রতিদিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের কমপক্ষে ১১৫ গ্রাম ফল খাওয়া দরকার। নীরোগ জীবন ধারণের জন্য নিত্যদিনই কিছু না কিছু ফল খাওয়া দরকার। কিন্তু ফলের অভাবহেতু আমরা এই চাহিদাকে পূরণ করতে পারছি না। তাই সরকারের শ্লোগানকে কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রত্যেককেই উচিত, যে যেভাবেই পারিনা কেন কিছু কিছু ফলজ , বনজ ও ওষধি বৃক্ষ রোপন করা। তবেই আমরা দেহের পুষ্টিহীনতা দূর করার সাথে দেশকে নির্মল পরিবেশে সমৃদ্ধ করে আমাদের আর্থিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারব।

মনের স্বাধ মিটিয়ে কেবল ভক্ষণ করার জন্যই ফল নয়। আমাদের দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন ফলে ভিন্ন ভিন্ন ওষধিগুণও রয়েছে যা- আমাদের সুস্থ জীবন ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রবন্ধের আকার যাতে নাতি দীর্ঘ হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের সু-পরিচিত কয়েকটিমাত্র ফলের ওষধিগুণ উল্লেখ করে আমার লেখাকে শেষ করার চেষ্টা করব।

(০১) **ফলের রাজা আম** ঃ এই ফলের প্রাপ্তিকাল হচ্ছে বৈশাখ হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত।

ওষধিগুণ ঃ পাকা আম ক্যারোটিনে ভরপুর। এ ছাড়াও এতে রয়েছে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান, ইউনানী ও আর্যুবেদীয় চিকিৎসায় পাকা আম ল্যাকজেটিভ, রোচক ও টনিক অর্থাৎ বলকারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ফল যকৃত বা লিভার এর জন্য উপকারী। অন্ধত্ব এবং রাতকানা প্রতিরোধে পাকা এবং কাঁচা আম উভয়ই একটা মহৌষধ, রক্ত ঝরা বন্ধ করণের জন্য আম গাছের বিভিন্ন অংগের রস বেশ উপকারী। আম গাছের কচি পাতার রস দাঁতের ব্যথা উপশম করে। আমের শুকনা মুকুল পাতলা পায়খানা, দীর্ঘদিনের আমাশয় এবং প্রস্রাবের জ্বালা-যন্ত্রনায় বেশ কাজ করে। গাছের আঁঠা পায়ের ফাঁটা ও চর্মরোগ উপশমে উপকার আসে, জ্বর, বুকের ব্যথা, বহুমুত্র রোগের জন্য আমের পাতার চুর্ন বেশ ভাল কাজ করে।

(০২) **জাতীয় ফল কাঁঠাল** ঃ প্রাপ্তিকাল বৈশাখ হতে শ্রাবন মাস পর্যন্ত।

ওষধিগুণ ঃ চীন দেশে কাঁঠালের শাঁস ও বীজকে বলবর্ধক হিসাবে বিবেচনা করে। কাঁঠালের পোড়া পাতার ছাইয়ের সাথে নারিকেলের খোসা ও ভুট্টা একত্রে পুড়িয়ে সেই মিশ্রণ নারিকেল তেলের সাথে মিশিয়ে 'ঘা' কিংবা ক্ষত স্থানে ব্যবহার করলে তা ঘা-কে উপশম করে। কাঁঠাল গাছের শিকড়েরর রস জ্বর ও পাতলা পায়খানা নিরাময়ে সহায়তা করে।

(০৩) **পেঁপে ফল** ঃ প্রাপ্তি কাল মোটামোটি সারা বছরই।

ওষধিগুণ ঃ পেঁপেফল রোগীদের পথ্য হিসাবে পরিচিত। কাঁচা পেঁপের পেপেইন নামক উপাদান খাদ্য হজমে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পাকা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণ ক্যারোটিন আছে। অজীর্ন কৃমি, আলসার, ত্বকে ঘা, একজিমা, কিডনী সংক্রান্ত জটিলতা, ডিপথেরিয়া ও পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে কাঁচা পেঁপের পেপেইন বেশ উপকারী, পেঁপের আঁঠা ও কশ হজমকারক এবং বীজ ক্রিমিনাশক ও প্লীহা যকৃতের জন্য হিতকর।

(০৪) **কলা** ঃ প্রাপ্তি কাল সারা বছর।

ওষধিগুণ ঃ আদিকাল থেকেই কলা প্রায় সব রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পাকা কলা কোষ্ঠকাঠিন্যতা দূরীকরণে বেশ সহায়ক। কলার থোড় ও মোচা এবং শিকড় ডায়াবেটিস, আমাশয়, পেটের আলসার এবং পেটের অন্যান্য পীড়া উপশম করে। সবজি কলা পেটের পীড়া উপশম করে। সবজিকলা বেশ পুষ্টি সমৃদ্ধ, সবজি কলা পেটের পীড়ায় রোগিদের পথ্য হিসেবে কাজ করে। পাকা বীচিকলা-পেটের নানা রকম পীড়া উপশমের মহৌষধ।

(০৫) **তেতুল** ঃ প্রাপ্তিকাল পৌষ থেকে ফাল্গুন মাস।

ওষধিগুণ ঃ ইহা চিহ্নিত একটি ভেষজ ফল। পেট ফাপা, হাত-পা জ্বালায় তেতুলের শরবত খুবই উপকারী। তেঁতুলের কচি পাতা সিদ্ধ করে ঠান্ডা করে খেলে সর্দি উপশম হয়। তেঁতুলের টারটারিক এসিড খাদ্য হজমে সহায়তা করে। মাথা ব্যাথা , ধুতরা ও কচুর বিষাক্ততা ও রাসায়নিত বিষ, এ্যালকোহলের বিষাক্ততা নিরাময়ে ফলের শাসের শরবত বেশ কাজ করে। ইহা ব্যবহারে প্যারালাইসিস অঙ্গের অনুভূতি ফিরিয়ে আনে। গাছের ছালের চুর্ণ ব্যবহারে দাঁত ব্যাথা, হাঁপানী, চোখ জ্বালা পোড়া নিরাময় হয়।

(০৬) **আমলকি** ঃ প্রাপ্তি কাল মাঘ মাস হতে চৈত্র মাস।

ওষধিগুণ ঃ আমলকি ভিটামিন সমৃদ্ধ একটি ফল। ১০০ গ্রাম আমলকিতে ৪৬৩ মিগ্রাঃ ভিটামিন সি আছে যা অন্য আর কোন ফলেই নেই। তাই ইহাকে ভিটামিন সি এর রাজা বলা হয়। আমলকির রস যকৃত, পেটের পীড়া, হাঁপানি, কাশি, বহুমূত্র, অজীর্ন ও জ্বর নিরাময়ে কাজ করে। এর পাতার রস আমাশয় প্রতিষেধক ও বলকারক। আমলকির রসের শরবত জন্ডিস , বদহজম ও কাশির জন্য হিতকর। হাঁপানি, কাশি বহুমূত্র ও জ্বর আরোগ্যে এর বীজ ব্যবহার করা হয়।

(০৭) **জাম** ঃ প্রাপ্তি কাল ঃ জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় মাস।

ওষধিগুণ ঃ জামের কচি পাতা পেটের পীড়া নিরাময়ে কাজ করে। জামের বীজ থেকে আহরিত পাউডার বহুমূত্র রোগের ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পাকা

জাম সৈন্ধব লবণ মাখিয়ে ৩-৪ ঘন্টা রেখে চটকিয়ে ন্যাকড়ার পুটলি বেঁধে টানিয়ে রাখলে পর যে রস হয় তা পাতলা দাস্ত, অরুচি ও বমিভাব দূর করে। জাম ও আমের রস একত্রে পান করলে বহুমূত্র রোগীর তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

(০৮) **ডাব** ঃ প্রাপ্তিকাল সারা বছর ।

ওষধিগুণ ঃ খাদ্যোপযোগী ডাবের পানিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। বিবিধ পেটের গোলযোগে গ্লুকোজ স্যালাইনের বিকল্প হিসাবে ডাবের পানি খুবই উপকারী। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা ও বমির ফলে দেহে যে পানি শূণ্যতা ঘটে তা পূরণে ডাবের পানি অত্যন্ত কার্যকর। এটি পিত্ত এবং কৃমি নাশকও বটে। ফলের মালা বা আইচা পুড়িয়ে পাথর বাটি চাপা দিয়ে পাথরের গায়ে যে গাম কিংবা কাই হয় তা দাদ নিরাময়ের মহৌষধ।

(০৯) **আনারস** ঃ প্রাপ্তিকাল জ্যৈষ্ঠ মাস হতে শ্রাবন মাস পর্যন্ত।

ওষধিগুণ ঃ পাকা ফল বলকারক, কফপিত্ত বর্ধক, পাচক, কাঁচা ফল গর্ভপাতকারী, পাকা ফলের সদ্য রসে ব্রোমিলিন নামক এক প্রকার জারক রস থাকে বলে এই ফল পরিপাক ক্রিয়া সহায়ক এবং রস পান্ডুরোগে হিতকর। কচি ফলের শাঁস ও পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে সেবন করলে কৃমির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(১০) **ডালিম** ঃ প্রাপ্তিকাল মাঘ হতে ফাল্গুন মাস।

ওষধিগুণ ঃ এটা বেশ পুষ্টিকর একটি ফল। ডালিমের রস কুষ্ঠ রোগে কাজ করে। গাছের ছাল, পাতা, অপরিপক্ক ফল এবং ফলের খোসার রস পাতলা পায়খানা, আমাশয় ও রক্তক্ষরণ বন্ধে সহায়ক।

(১১) **বাতাবী লেবু (জাম্বুরা)** ঃ প্রাপ্তিকাল আশ্বিন থেকে কার্তিক মাস।

ওষধিগুণ ঃ ইহা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি পুষ্টিকর ফল। এই ফল জ্বরের রোগীদের জন্য বেশ উপকারী। এর পাতা, ফুল ও ফলের খোসা গরম পানিতে সিদ্ধ করে পান করলে মৃগী, হাত-পা কাঁপা ও প্রচন্ড কাশি রোগীর প্রশান্তি আনয়ন করে।

(১২) **লেবু** ঃ প্রাপ্তিকাল জ্যৈষ্ঠ মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত।

ওষধিগুণ ঃ মন ভোলানো বিভিন্ন গন্ধ ও টক জাতীয় ফল। এতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি আছে। লেবুর রস মধুর সাথে অথবা লবণের সাথে কিংবা আদার সাথে মিশিয়ে পান করলে ঠান্ডা ও সর্দিকাশি উপশম হয়। এবং ক্ষত শুকায়।

(১৩) **পেয়ারা** ঃ প্রাপ্তিকাল শ্রাবন থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত।

ওষধিগুণ ঃ এর শিকড়, গাছের ছাল, পাতা এবং অপরিপক্ক ফল কলেরা, আমাশয় ও অন্যান্য পেটের পীড়া উপশমে ভাল কাজ করে। ক্ষত বা ঘা- এর মধ্যে থেতলানো পতার প্রলেপ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এর পাতা চিবালে দাঁতের ব্যথা উপশম হয়।

(১৪) **কুল (বরই)** ঃ প্রাপ্তিকাল মাঘ মাস হতে চৈত্র মাস পর্যন্ত।

ওষধিগুণ ঃ কুল একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। এর ফল ও পাতা বাটা বাতের জন্য বেশ উপকারী। ফল রক্ত শোধন, রক্ত পরিষ্কারক এবং হজমীকারক। পেটে গ্যাস ও অরুচি, অতিসারে, প্রদর রোগ নিরাময়ে এর ফুল থেকে তৈরী ওষধ ব্যবহার করা হয়। শুকনো ফুলের গুড়ো ও আখের গুড় মিশিয়ে চেটে খেলে মেয়েদের সাদা স্রাবের উপকার হয়।

(১৫) **বেল** ঃ প্রাপ্তি কাল ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত।

ওষধিগুণ ঃ এতে কমবেশী সব পুষ্টিই বিদ্যমান। বেল কুষ্ঠ কাঠিন্য ও আমাশয় নিরাময়ে কাজ করে। আধাপাকা সিদ্ধ ফল আমাশয়ে অধিক কার্যকর। বেলের শরবত হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং বল বর্ধক হিসাবে কাজ করে। বেলের পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে পান করলে চোখের ছানি ও জ্বালা উপশম হয়, পাতার রস, মধু ও গোল মরিচের গুড়ো মিশিয়ে পান করলে জন্ডিস রোগের উপকার হয়।

(১৬) **কমলা** ঃ প্রাপ্তি কাল অগ্রহায়ন হতে মাঘ মাস পর্যন্ত।

ওষধিগুণ ঃ ইহা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল। কমলা সর্দি জ্বর উপশমে কাজ করে। ফলের ছাল বমি নিবারক। ফলের শুষ্ক ছালে শারিরীক দুর্বলতা দূর করে। ফুলের রস মৃগী রোগ নিবারক।

(১৭) **আমড়া** ঃ প্রাপ্তিকাল জ্যৈষ্ঠ মাস হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত।

ওষধিগুণ ঃ এতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান ও প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি আছে। আমড়া ফল পিত্ত ও কফ নিবারক, আমনাশক ও কণ্ঠস্বর পরিষ্কারক। পিত্ত বসন ও অরুচিতে এর ব্যবহার হয়।

(১৮) **কামরাঙ্গা** ঃ প্রাপ্তিকাল অগ্রহায়ন মাস হতে মাঘ মাস পর্যন্ত।

ওষধিগুণ ঃ ইহা পুষ্টিকর ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি ফল। পাকা ফল রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। ফল এবং পাতা গরম পানিতে সিদ্ধ করে পান করলে বমি বন্ধ হয়। পাতা ও ডগার গুড়ো সেবনে জল বসন্ত ও বক্র কৃমি নিরাময় হয়।

এমনিভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, আমাদের বহু ফলেই বহুবিধ ওষধিগুণ রয়েছে কিন্তু তা আমরা তেমনিভাবে দৃষ্টিতে আনি না এবং এগুলোকে আমরা সাদরে গ্রহণ করি না। ফল দেহের রং সুন্দর করে মনের চেতনা বাড়ায় ও চামড়ার মসৃনতা বৃদ্ধি করে। তাই বেশি বেশি ফল খাওয়া দরকার। দেশীয় ফলের গুণাগুণ বিদেশী ফলের চেয়ে কোন অংশেই কম নয় বরং বেশি । কিন্তু এর প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করতে হবে। সুতরাং আমরা সবাই মিলে দেশী ফল গাছ লাগাই এবং সুন্দর স্বাস্থ্য ও নির্মল পরিবেশ গড়ে তুলি।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ পুস্তক আমাদের দেশী ফল, এ আই এস)

মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী

আতফাল ও মাতাপিতা দিবস পালিত

গত ১৫ই জুলাই ২০০৫ইং শুক্রবার মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, নারায়নগঞ্জ এর উদ্যোগে আতফাল ও মাতাপিতা দিবস "সফলভাবে পালন করা হয়েছে, আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কায়েদ মঃ খোঃ আঃ নাঃ গঞ্জ। প্রধান অতিথি ছিলেন আমীর, আঃ মুঃ জাঃ নাঃগঞ্জ। দিবসে খোদ্দাম, আতফাল, আনসার , লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণী ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ নারায়নগঞ্জের ৫ম বার্ষিক ইজতেমা ২০০৫ইং উদ্‌যাপিত

গত ১৭/০৬/০৫ইং বাজামা'ত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌, নারায়নগঞ্জের ৫ম বার্ষিক ইজতেমা ২০০৫ সুসম্পন্ন হয়। সকাল ৮-৩০ সময় জাতীয় পতাকা ও মজলিসের পতাকা উত্তোলনের পর অনুষ্ঠানের ১ম অধিবেশন শুরু হয় ও সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আহমদ তবশির চৌধুরী, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম্‌ আব্দুল জলিল, রিজিওনাল নাযেম, মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ঢাকা রিজিওন। অনুষ্ঠানে সর্বমোট ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন এবং এর মধ্যে আনসার উপস্থিত ছিলেন ৩৪ জন। বিভিন্ন তরবিয়তী বক্তৃতার মাধ্যমে অধিবেশনদ্বয় সমাপ্ত হয়।

নারায়নগঞ্জ জামাতে সীরাতুন্‌নবী জলসা উদযাপিত

গত ২২/০৭/০৫ইং বাদ জুমুআ মোহতরম্‌ হেলাল উদ্দিন আহমদ, আমীর আঃমুঃজাঃ নারায়নগঞ্জের সভাপতিত্বে "সীরাতুন্‌নবী" অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বাল্য জীবন, তাঁর (সঃ) প্রতি ভালবাসার গুরুত্ব , তাঁর (সঃ) তবলীগের পদ্ধতি এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন। এতে মোট উপস্থিত ছিলেন ১০২ জন।

আহমদ আলী
জেনারেল সেক্রেটারী
আঃ মুঃ জাঃ নারায়নগঞ্জ

দৃষ্টি আকর্ষণ

- পাক্ষিক আহমদীর নতুন বছর জুলাই-২০০৫ থেকে শুরু হয়েছে। যাদের চাঁদা বকেয়া আছে অনতিবিলম্বে চাঁদা পরিশোধ করার জন্য বিনীত আবেদন করা হলো।
- যারা স্থানীয় জামাতে পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা দিয়ে থাকেন তারা অবশ্যই রশিদের ফটোকপি অথবা চিঠি দিয়ে সেক্রেটারী ইশায়াত বরাবর জানিয়ে দিবেন। যাতে আমাদের হিসাব রাখতে সুবিধা হয়। কেননা স্থানীয় জামাতে চাঁদা দিলে উক্ত চাঁদার রশিদ আমাদের দপ্তরে পৌছাতে অনেক সময় লাগে। অনেক সময় সরাসরি আসলেও সঠিক নাম ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে জন্য চিঠিতে নাম/ ঠিকানা রশিদ নং তারিখ ও টাকার বিবরণ লিখে জানাবেন। তা না হলে চাঁদা পরিশোধ করেও আপনি বকেয়াদার থেকে যেতে পারেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

শুভ বিবাহ

- কৃষ্ট নগর, পোঃ সোহরাওয়ার্দী হাট, মরহুম আবদুল আজিজ মাহবুবুর এর কন্যা মোসাম্মাৎ নাসিমা আক্তার এর বিয়ে চরচন্ডাইল পোঃ গলাচিপার মরহুম হাজী কাশেম আলী খাঁন এর পুত্র জনাব আশরাফ আলী খাঁন এর সাথে গত ২৭-০৯-২০০৪ইং ৫০,০০১/- টাকা দেনমোহরানায় অনুষ্ঠিত হয়। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌।

  বিয়ের রেজিঃ নং-০৪৭১/০৪।

- গত ২২-০৮-০৪ইং সুন্দরবন জামাতের জনাব জিন্নাত আলী সরদার এর কন্যা মোসাম্মাৎ কবরী পারভীন এর বিয়ে সুন্দরবন জামাতের জনাব নওশের আলী ফকিরের পুত্র জনাব বকুল আহমদ ফকির এর সাথে ২২,০০১/- (বাইশ হাজার এক) টাকা দেনমোহরানায় অনুষ্ঠিত হয়। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌।

  বিয়ের রেজিঃ নং-০৪৭০/০৪।

- গত ০৩-০৯-০৪ইং সুন্দরবন জামাতের জনাব শহীদ সোবহান মোড়ল এর কন্যা মোসাম্মাৎ জুলেখা খাতুন এর বিয়ে চরদুখিয়া জামাতের জনাব হাফেজ আহমদ পাটোয়ারী এর পুত্র জনাব শরিফ আহমদ পাটোয়ারী এর সাথে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা দেনমোহরানায় অনুষ্ঠিত হয়। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌।

  বিয়ের রেজিঃ নং-০৪৬৯/০৪।

- গত ০৭-০৭-০৪ইং ধানী খোলা জামাতের জনাব আব্দুল আজিজ এর কন্যা মোসাম্মাৎ তাঁহেরা পারভিন এর বিয়ে খুলনা জামাতের জনাব মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন গাজী এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম গাজী এর সাথে ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা দেনমোহরানায় অনুষ্ঠিত হয়। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌।

  বিয়ের রেজিঃ নং-০৪৬৭/০৪।

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি বাংলার আহমদীয়াতের কৃতী সন্তান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের সাবেক ন্যাশনাল আমীর **আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব** গত ১০-০৮-২০০৫ইং সন্ধ্যা ৭.২০ মিনিটে ল্যাব এইড কার্ডিয়াক হাসপাতালে ৭৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১১-০৮-২০০৫ইং সকাল ১০.৩০ মিনিটে তাঁর প্রথম নামাযে জানাযা আমাদের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ 'দারুত তবলীগে' অনুষ্ঠিত হয়। নামাযে জানাযা পড়ান **মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান,** ন্যাশনাল আমীর সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ। তারপর তাঁর মরদেহ ময়মনসিংহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রেসক্লাবে সর্বসাধারনের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শেষে আকুয়াস্থ আমাদের মসজিদে দ্বিতীয় জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের ওসিয়্যত অনুযায়ী তাঁর একমাত্র পুত্র সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ **আহমদ তবসির চৌধুরী দ্বিতীয়** জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। তাঁকে পরে আকুয়াতে আমাদের কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র, তিন কন্যা, ৭ নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষি ও বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। আমরা তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদেরকে সমবেদনা জানাই এবং তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি, দোয়া করি আল্লাহতাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমীন॥

শোক প্রস্তাব

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুতে ১৪/০৮/০৫ তারিখের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সভায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

প্রস্তাবে প্রাক্তন ন্যাশনার আমীর সাহেবের মৃত্যুতে গভীর শোক ও আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং পরম করুণাময় আল্লাহতআলার দরবারে মরহুমের রূহের মাগফিরাত ও বেহেশতে তাঁর উচ্চ মোকাম কামনা করা হয়।

সভায় তাঁর শোকসন্তপ্ত পত্নী, পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়। আর দোয়া করা হয় যেন আল্লাহতায়ালা তাদেরকে সবরে জামিল দান করেন। আমীন॥

জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ইং সনে সুনামগন্‌জের বীরগাও মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি সুনামগন্‌জের সেলবরসে বিখ্যাত জমিদার পরিবারে। তিনি প্রাথমিক পড়াশুনা গ্রামের পাঠশালায় সম্পন্ন করেন। স্কুল ও কলেজের পড়াশুনা সিলেট, সুনামগন্‌জ ও ময়মনসিংয়ে সম্পন্ন করেন।

তিনি ১৯৫৫ সালে খৃষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা শুরু করেন। পরে ১৯৫৭ইং সালের ১৯শে মে তারিখে তিনি বয়াত গ্রহণ

করে জামাতে আহমদীয়ায় দাখিল হন। সাথে অবশ্য তাঁর স্ত্রীও বয়াত করেন। বয়াতের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জামাতে আহমদীয়ার অসাধারণ সেবা করে গেছেন।

তিনি ১৯৬০ সাল থেকে ধর্মের সেবায় নিজেকে ওয়াক্‌ফ করে আমৃত্যু জামাতে আহমদীয়ার সেবা করে গেছেন। তিনি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভারত, পাকিস্তান, ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার অনেক দেশ সফর করেছেন। তিনি একজন সুপন্ডিত, সুবক্তা, সুলেখক, ইসলামী চিন্তাবিদ, বিজ্ঞগবেষক ও বহু ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সি, হিন্দি, হিব্রু, ইংরেজী, বাংলাসহ বহু ভাষা জানতেন। তাঁর রচিত পুস্তক ইংরেজী, হিন্দি ভাষায়ও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বহু ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও গবেষণা করেছেন। ইসলাম, হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ, বাহাই প্রভৃতি ধর্মের উপর লেখা তাঁর শতাধিক পুস্তক রয়েছে। এছাড়াও তিনি দুটি পত্রিকারও (সাপ্তাহিক আল মিনার, দ্বি-মাসিক খাতুপত্র) সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখা ও বক্তৃতা দু'টোই পাঠক ও শ্রোতাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তাঁর লেখা পড়ে, তবলীগ ও বক্তৃতা শুনে দেশ-বিদেশের অনেক লোক আহমদী হয়েছেন, হচ্ছেন, আর ভবিষ্যতেও হবেন, ইনশাআল্লাহ্।

তিনি জামাতের প্রেসিডেন্ট, খোদ্দাম প্রধান, সেক্রেটারী, নায়েবে আমীরের পদে কাজ করেছেন। তিনি ২১শে মে ১৯৯৫ থেকে ৩১মে ১৯৯৭ পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর ছিলেন। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য, ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব-এর সহ-সভাপতিসহ বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৭০ সালে হজ্জ করেন। তিনি একজন মুসী (ওসিয়্যতকারী) ছিলেন। আর মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তাঁর ওসিয়্যত এর হিস্যায়ে জায়েদাদ ১/৫ অংশ আদায় করে গেছেন।

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD
CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ।

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে
স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার
পরিবেশনে অনন্য

ধানসিড়ি রেস্তোরা ১
নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১
গুলশাল ২ ঢাকা ।
ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫

ধানসিড়ি খাবার
ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা
(রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 68 ❑ 3rd Issue

August 15, 2005. ❑ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

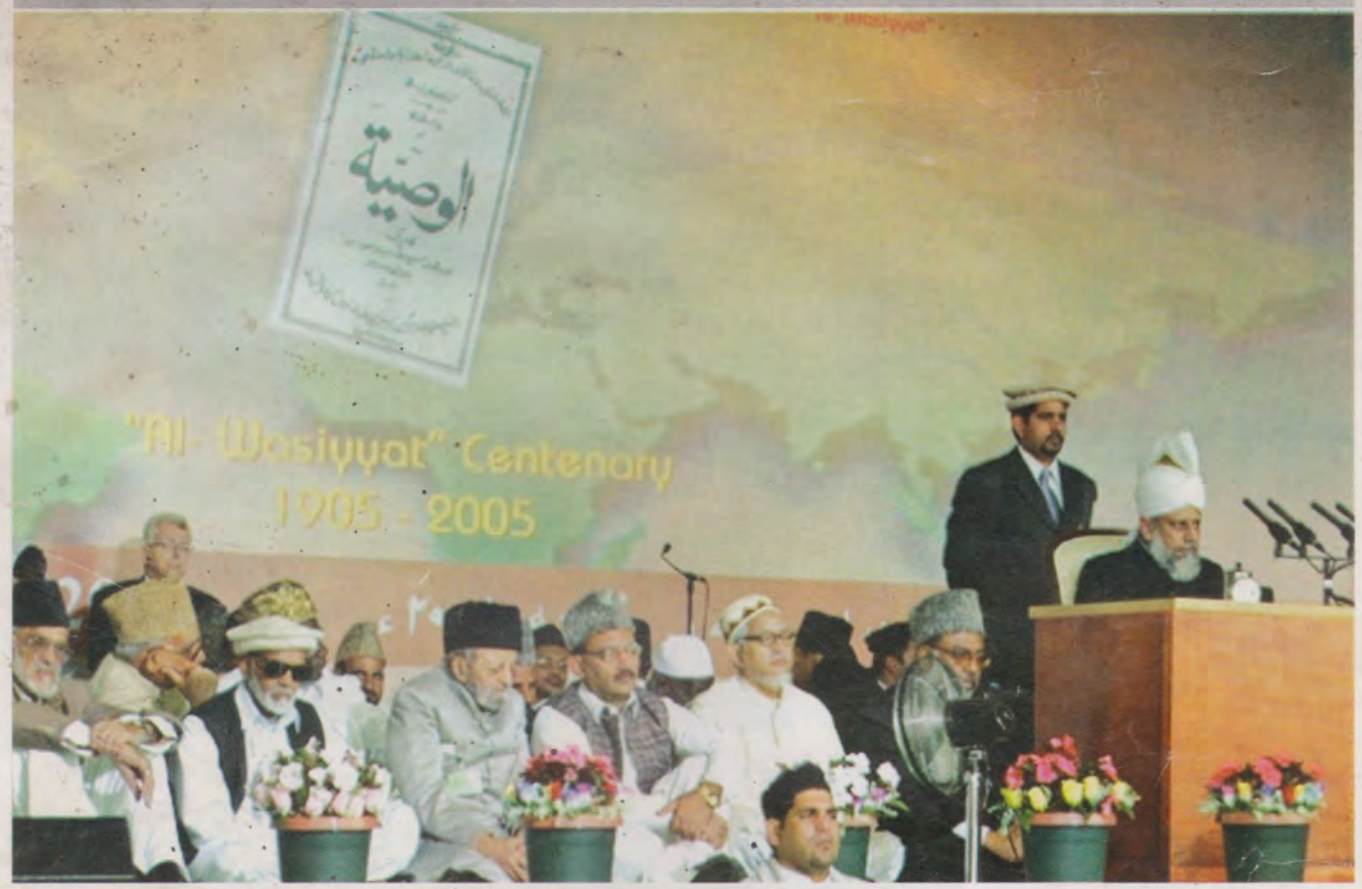

যুক্তরাজ্য জামাতের জলসা সালানা-২০০৫

ঢাকা জামাতের একজন বিশিষ্ট সদস্যকে বিদায় সংবর্ধনা

মোহতরম জনাব মোহাম্মদ আফজল চৌধুরী সাহেব আমহদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকার একজন বিশিষ্ট সদস্য। তিনি পাকিস্তানী (পাঞ্জাবী) বংশোদ্ভূত একজন আমেরিকান নাগরিক। কার্যোপলক্ষে ২০০৩ সালে তিনি বাংলাদেশে আসেন। তিনি ছিলেন একজন রীতিমত চাঁদা দাতা। বাংলাদেশের জামাতের সংকটের দিনে অনেক অবদান রেখেছেন। আমাদের এ সুহৃদ বন্ধু বিগত ২৪ জুলাই তারিখ ঢাকা ছেড়ে নিজ দেশ আমেরিকায় চলে গেছেন। বিগত ১৯ জুলাই ঢাকা জামাত তাঁর বিদায় উপলক্ষ্যে বাদ মাগরিব একটি সংবর্ধনার আয়োজন করে লাইব্রেরী কক্ষে। ঢাকা জামাতের মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দ, ন্যাশনাল আমীর এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা জামাতের আমীর জনাব আফজল আহমদ খাদেম, জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী, জনাব মাহবুব হোসেন, মাওলানা আব্দুল আজীজ সাদেক এবং সব শেষে ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশেরউর রহমান সাহেব তাঁর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনিও সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ন্যাশনাল আমীর সাহেব জামাতের পক্ষ্য থেকে তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে ভালবাসার নিদর্শন প্রকাশ করেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road,
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com